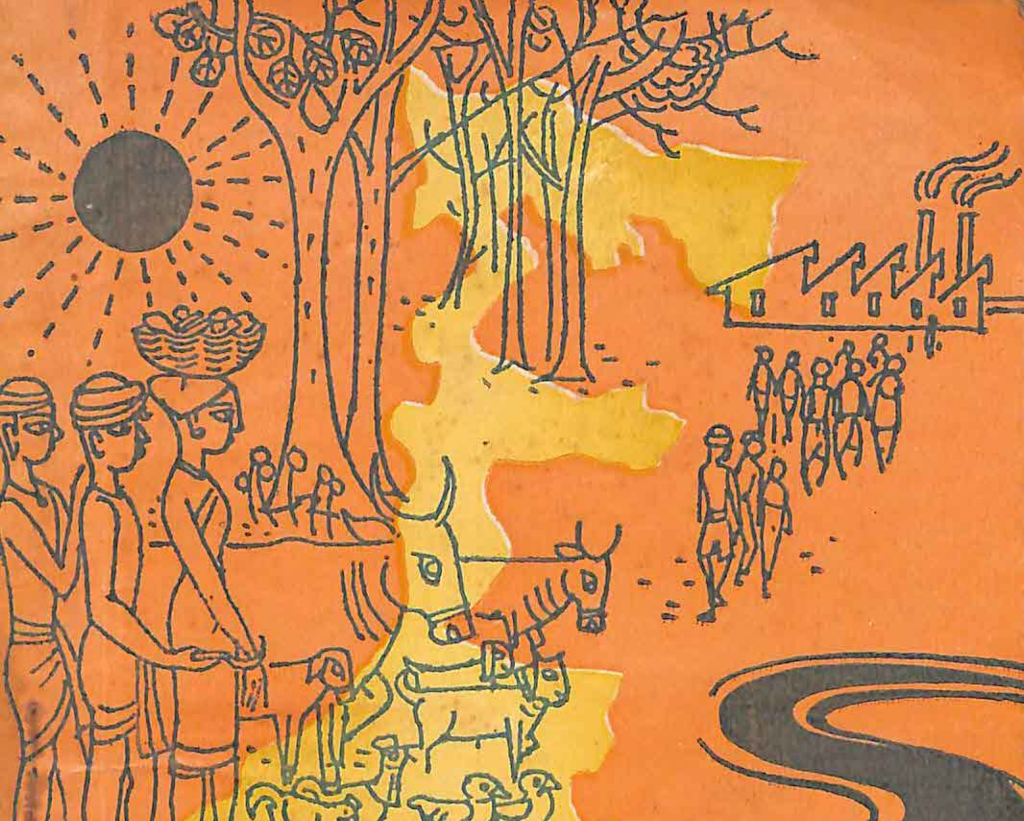


১

দেশ ও মানুষ

অধ্যাপক দিলীপ ভাদুড়ী

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ প্রবর্তিত নতুন সিলেবাস অনুসারে লিখিত এবং
পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর
পাঠ্য হিসাবে নির্ধারিত।

দেশ ও মানুষ

প্রথম খণ্ড

(পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের প্রারম্ভিক পরিচয়)

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

শ্রীদিলীপ ভাদুড়ী, এম্. এ., বি. টি.,
রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দিরের (বেলুড়, বি. টি. কলেজ) অধ্যাপক
ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৭৩
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুআরি ১৯৭৪

মূল্য : তিন টাকা

গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ন্যাশনাল পাবলিশার্স হইতে প্রকাশিত এবং
শ্রীসুকুমার চৌধুরি কর্তৃক **ঝর্ণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস**
৬৩-এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর আগামী বৎসর হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ্ বিদ্যালয়-গুলিতে নূতন পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রারম্ভিক পরিবর্তন হিসাবে আগামী বৎসরে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে নূতন পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী বই নির্বাচিত হইবে। নূতন পাঠ্যতালিকার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক মত ও যুক্তি আছে এবং মতের বিনিময় আগামী দিনেও চলিবে। তাই আপাততঃ পর্ষদ্ যে-পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাকে ভিত্তি করিয়া অনেক শিক্ষাব্রতী বই লিখিবার কাজে ব্রতী হইয়াছেন। শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের একজন শিক্ষক হিসাবে অল্পকিছু অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করিয়া আমিও এই দুঃসাহসিক কাজে অগ্রসর হইয়াছি এবং ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর জন্য দুইখানি ভূগোলের বই লিখিয়াছি।

ভূগোলের পাঠ্যতালিকা মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। এতদিনের পাঠ্যতালিকায় ভূগোল আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে ছিল না। আমি মনে করি, ভূগোলকে পাঠ্যতালিকায় আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে স্থান দিয়া পাঠ্যতালিকা রচয়িতাগণ যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভূগোল পঠনের মাধ্যমে নিজের দেশকে জানা ও দেশের মানুষকে চেনার সুযোগ থাকিত না এবং নিজের দেশের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সম্পদ এবং তাহার সমস্যা এইসব বিষয়ে চেতনা ছাত্রদের একেবারেই দেওয়া হইত না। নূতন পাঠ্যতালিকায় সেই সুযোগ কিছুটা আসিয়াছে।

আদিকালের ভূগোল (Geography of Capes & Bays) শিখাইবার কায়দা ছিল অন্যরূপ। কিছু জায়গার নাম, উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকা এবং সংখ্যা মুখস্থ করানোই ছিল ভূগোলের উদ্দেশ্য। শিক্ষকদের অভিজ্ঞতায় বলে, এই কায়দায় পড়ানোর ফলে বহুক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূগোলের প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে বিরাগ সৃষ্টি হয়। পৃথিবী ও বহির্বিশ্ব জানিবার অদম্য আগ্রহ প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে দেখা যায়। সব সময়ই তাহাদের কৌতূহলী মন পরিবেশে সংঘটিত বিচিত্র

ঘটনার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়। আমাদের কাজ সেই কৌতূহলকে বাড়াইয়া তোলা এবং প্রকৃতির ভিতর প্রতিটি ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা। পৃথিবী বিরাট এবং তাহার নানাবিধ সমস্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। কেহই সবকিছু একসঙ্গে জানিতে বা বুঝিতে পারে না। কিন্তু নির্বাচিত বিষয়বস্তু ও তাহাদের সমন্বয় সাধন করিতে সক্ষম হইলে অনেক সমস্যাই সরল হইয়া যায়। নূতন পাঠ্যতালিকায় গতানুগতিক চিন্তাধারার কিছুটা ব্যতিক্রম আছে।

ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, আমরা যে-রাজ্যে বাস করি তাহার সম্পর্কে পরিচিতি মোটামুটিভাবে ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা এবং একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নিকটতম প্রতিবেশী ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের বিবরণ দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে তাই পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে তাহাদের প্রাথমিক জ্ঞান আছে ধরিয়া লইতে হইবে। ঐ স্তরে তাহাদের সম্মুখে পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলা হয় এবং মানুষের বৃত্তি বা আমাদের সমাজের বন্ধু ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়। এই স্তরে (মাধ্যমিক) সেই জ্ঞানকে আরও সুসংহত করিবার জন্য প্রকৃতি ও মানুষের কাজের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করিতে শেখানো উচিত এবং নিজের রাজ্যের পরিধির বাহিরে যে জগৎ আছে তাহার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলিয়া ধরা উচিত। বই লিখিবার সময় সেইদিকে নজর রাখা হইয়াছে।

সম্পূর্ণভাবে পাঠ্যতালিকার নির্দেশ পালন করা হইয়াছে। খুব তাড়াতাড়ি লেখা হইয়াছে—অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিশ্চয়ই থাকিবে। ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য সকলেরই সহযোগিতা কামনা করি।

বইএ মানচিত্র, আলোকচিত্র বা অন্যান্য রেখাচিত্র সম্ভবমত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্থান-সংকুলানের একটা প্রশ্ন আছে। তাই আরও বিস্তারিতভাবে মানচিত্রের সাহায্য লইতে হইবে। ভূচিত্রাবলী (Atlas) প্রতিটি ছাত্রের নিকট থাকিলে ভাল হয়।

এই বই লিখিবার ব্যাপারে আমার শিক্ষক-ছাত্রবন্ধুরা যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন ; তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। বই প্রকাশনার ব্যাপারে ন্যাশনাল পাবলিশার্স-এর বন্ধুবর শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। প্রচ্ছদপট ও চিত্র আঁকিয়াছেন আমার সহযোগী অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী এবং নানাদিক দিয়া সাহায্য করিয়াছেন বেলুড় বি. টি. কলেজের ভূগোল বিভাগের আমার সহযোগী শ্রীনিতাইচন্দ্র মোদক। অনেকগুলি আলোকচিত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছেন যতীন্দ্রমোহন এভেনিউ-এর রিনা স্টুডিও-এর শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার হালদার—ইঁহাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, শিক্ষক বন্ধুদের কাছে একটি অনুরোধ যে তাঁহারা এই বই পড়িয়া খোলামনে সমালোচনা ও মতামত পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং ভবিষ্যতে সেই অনুযায়ী বইকে মার্জিত করিবার প্রচেষ্টা করিব।

দিলীপ ভাদুড়ী

৩১, মদনমোহনতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৫
৭ই নভেম্বর, ১৯৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'দেশ ও মানুষ' ১ম ও ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকা মহল হইতে প্রভূত পরিমাণে সাড়া পাওয়া গিয়াছে। এই বই দু'খানির নূতনত্ব বিশ্লেষণ করিয়া অনেকেই চিঠি লিখিয়াছেন এবং কিছু কিছু ত্রুটি সম্পর্কেও সজাগ করিয়াছেন।

দুইটি খণ্ডের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। সকলের সহযোগিতায় এ-কাজ সম্ভব হইয়াছে। তাই সকলকেই আমার ধন্যবাদ জানাই এবং ভবিষ্যতে সকলের মতামত ও সমালোচনার ভিত্তিতে বইগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করিতে পারিব বলিয়া আশা রাখি।

দিলীপ ভাদুড়ী

৩১, মদনমোহনতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৫
২৮শে জানুয়ারী, ১৯৭৪

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ১-১২

দেশ পরিচিতি—অধিবাসী—খাদ্য—পোশাক-পরিচ্ছদ—বাসস্থান—উপজীবিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ পরিচয় ১৪-১৬

ভূ-প্রকৃতি—উত্তরে হিমালয় পর্বতমালার অংশ—পশ্চিমে ঢেউ-খেলানো মালভূমি—পূর্বে বিস্তীর্ণ সমভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চল—পশ্চিমবঙ্গের নদনদী—পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু—পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা।

তৃতীয় অধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গের উৎপন্ন দ্রব্য ২৭-৪৩

বনজ সম্পদ—কৃষিজ সম্পদ—জলসেচ ও কৃষি—পশু ও পাখি পালন—মাছের চাষ।

চতুর্থ অধ্যায় : খনিজ সম্পদ ও শিল্পসম্ভার ৪৪-৫৭

খনিজ সম্পদ—কয়লা—চীনামাটি—চুনাপাথর—তাম্র—ম্যাঙ্গানিজ—ডলোমাইট—লৌহ—শিল্পসম্ভার—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প—চট শিল্প—কার্পাস শিল্প—চা শিল্প।

পঞ্চম অধ্যায় : ত্রিপুরা রাজ্য ৫৮-৬৮

দেশ-পরিচিতি—প্রাকৃতিক পরিবেশ—নদ-নদীর বিবরণ—জলবায়ুর অবস্থা—মৃত্তিকার প্রকারভেদ—ত্রিপুরার অধিবাসী—ত্রিপুরার উৎপন্ন দ্রব্য—বনভূমি—পশুপালন—খনিজ পম্পদ—শিল্পসম্ভার—হস্তশিল্প।

ষষ্ঠ অধ্যায় : বাংলাদেশ ৬৯-৭৯

দেশ-পরিচিতি—ভূ-প্রকৃতি—নদনদী—জলবায়ু—যানবাহন—অধিবাসী ও উপজীবিকা—খাদ্য ও বাসস্থান—উৎপন্ন-দ্রব্য—কৃষিজ—বনজ—খনিজ—শিল্পসম্পদ।

3419

মানচিত্র

			পৃষ্ঠা
১ ।	ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার অবস্থান	—	১
২ ।	পশ্চিমবঙ্গ (রাজনৈতিক)	—	২
৩ ।	পশ্চিমবঙ্গের লোকবসতি ও আদিবাসীদের বাসস্থান	—	৩
৪ ।	পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক গঠন ও নদনদীসমূহ	—	১৩
৫ ।	পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অঞ্চল	—	১৫
৬ ।	পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অঞ্চল	—	১৬
৭ ।	পশ্চিমবঙ্গের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল	—	১৭
৮ ।	পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিপাত	—	২২
৯ ।	পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা	—	২৪
১০ ।	পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কৃষিজ সম্পদ	—	৩১
১১ ।	পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিল্পাঞ্চল	—	৪৮
১২ ।	কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল	—	৫২
১৩ ।	ত্রিপুরা (রাজনৈতিক)	—	৫৮
১৪ ।	ত্রিপুরা (প্রাকৃতিক গঠন)	—	৬০
১৫ ।	বাংলাদেশ (রাজনৈতিক)	—	৬৯
১৬ ।	বাংলাদেশ (প্রাকৃতিক গঠন)	—	৭১

রেখাচিত্র

১৭ ।	নেপালী	—	৫
১৮ ।	রাজবংশী	—	৫
১৯ ।	সাঁওতাল	—	৫
২০ ।	লোধা	—	৫
২১ ।	পুরাতন পোশাকে বাঙালী পুরুষ	—	৫
২২ ।	সাধারণ পোশাকে বাঙালী মহিলা	—	৮
২৩ ।	আধুনিক পোশাকে বাঙালী পুরুষ ও মহিলা	—	৮
২৪ ।	মাটির দোতলা বাড়ি	—	৮
			৯

		পৃষ্ঠা
২৫।	পার্বত্য অঞ্চলের বাড়ি	৯
২৬।	ছনের ছাউনি	১০
২৭।	পাতার ঘর	১০
২৮।	টিনের ঘর	১০
২৯।	মাঝি	১১
৩০।	কারখানার শ্রমিক	১১
৩১।	চা বাগানের শ্রমিক	১১
৩২।	পাটক্ষেত	৩৪
৩৩।	চা বাগান	৩৬
৩৪।	জলসেচের একটি প্রাচীন পদ্ধতি	৩৮
৩৫।	হাঁস মুরগির চাষ	৩৯
৩৬।	নদীর জলে মৎস্য শিকার	৪১
৩৭।	যাত্রীবাহী নৌকা	৪২
৩৮।	দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা	৫০
৩৯।	কলিকাতা বন্দরে মালখালাস	৫৫
৪০।	পাহাড়ী পথ	৫৯
৪১।	খেয়াঘাটে হাটের দৃশ্য	৭৩

আলোক চিত্র

৪২।	পশ্চিমবঙ্গের জীবনরেখা ভাগীরথী—	২০
৪৩।	রেশমকীট তৈয়ারীর পদ্ধতি	২৯
৪৪।	ধান ঝাড়াইএর কাজে নিযুক্ত কৃষক	৩২
৪৫।	কলিকাতার কাছে একটি চটকল	৫১
৪৬।	কলিকাতার সংলগ্ন একটি রেলওয়ে ইয়ার্ড	৫৫
৪৭।	পশ্চিমবঙ্গের একটি জাতীয় সড়ক	৫৬
৪৮।	ঝুমচাষের আগে জমি তৈয়ারী করা হইতেছে	৬৫
৪৯।	ত্রিপুরার রবার চাষ	৬৬
৫০।	ত্রিপুরায় হাতীর সাহায্যে কাঠ সংগ্রহ	৬৬
৫১।	ধর্মনগর রেলষ্টেশন	৬৭
৫২।	নূতন মেঘনা সেতু	৭৪

প্রথম অধ্যায়

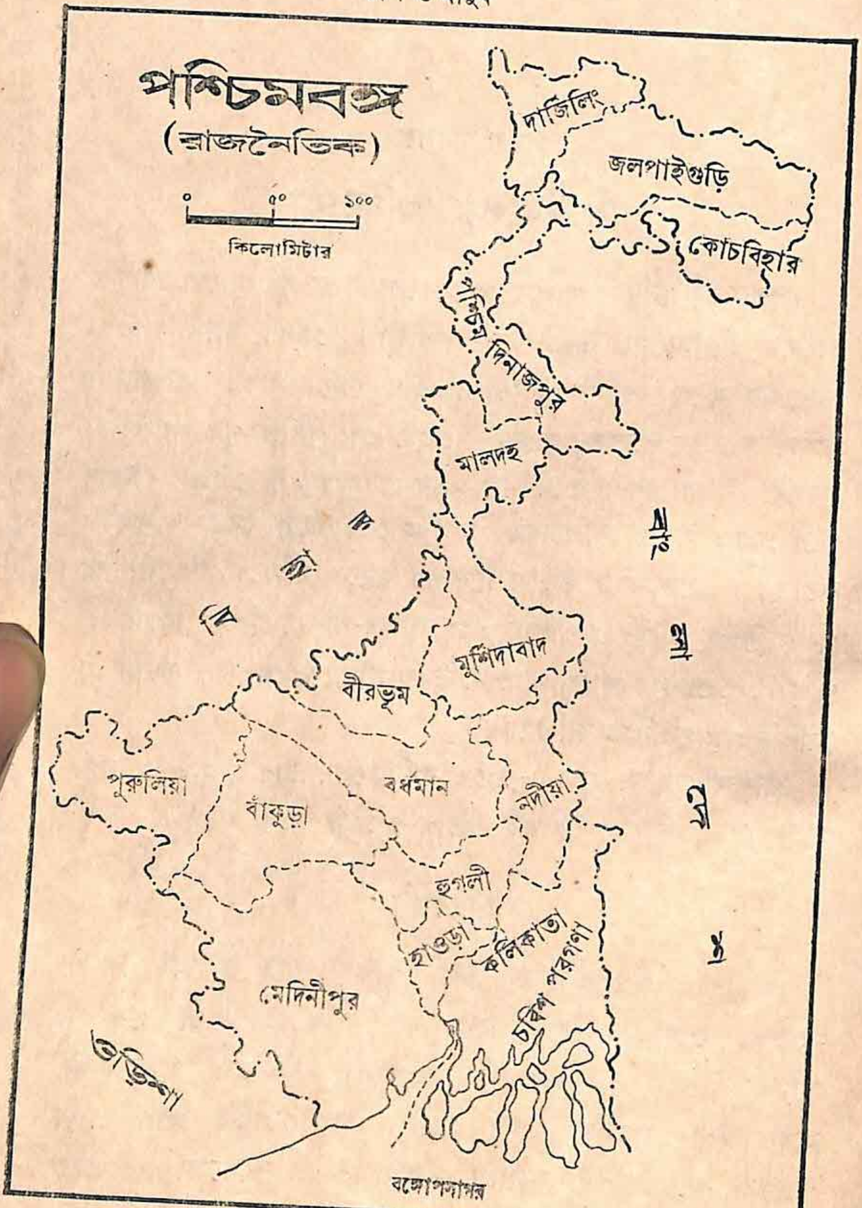
পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী

দেশ-পরিচিতি ঃ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ভারতীয় ইউনিয়নের একটি ছোট রাজ্য। ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের ফলে বঙ্গদেশ দুইভাগে ভাগ হইয়া যায়। পশ্চিমাংশ পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রহিল এবং পূর্বাংশ পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহার পরে ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিহার ও ওড়িশা, উত্তর-পূর্ব প্রান্তে আসাম, উত্তর সীমান্তে নেপাল, ভুটান ও সিকিম এবং পূর্বদিকে বাংলাদেশ।

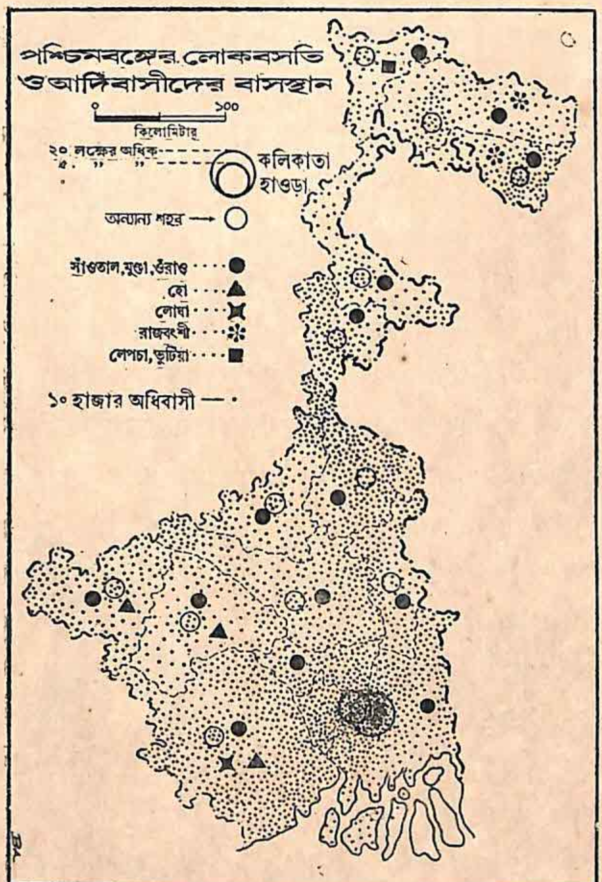
পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭৬১৭ বর্গ-কিলোমিটার (৩৩৮২৯ বর্গ-মাইল)। পশ্চিমবঙ্গে তিনটি বিভাগ ও ১৬টি জেলা আছে।

অধিবাসী

আয়তনে অন্য অনেক রাজ্য হইতে ছোট হইলেও শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। ভারতের জনবহুল স্থানসমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম। এই রাজ্যে চার কোটির উপর মানুষ বসবাস করে। এই অসংখ্য মানুষ উর্বর কৃষিক্ষেত্রে, উন্নত


পশ্চিমবঙ্গ
(রাজনৈতিক)
০ ৫০ ১০০
কিলোমিটার
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
পশ্চিম দিনাজপুর
মালদহ
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
বি হা র
বা ং লা দে শ
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বর্ধমান
নদীয়া
হুগলী
হাওড়া
কলিকাতা
চব্বিশ পরগণা
মেদিনীপুর
ওড়িশা
বঙ্গোপসাগর

শিল্পে এবং অন্যান্য অনেক রকমের উপজীবিকায় নিয়োজিত আছে। উত্তরে হিমালয় পর্বতের অন্তর্গত দার্জিলিং জেলা,



দক্ষিণে সাগর-বিধৌত সুন্দরবনের সৈকতভূমি, পশ্চিমে মালভূমির খনি অঞ্চল ও ঊষর ভূমি, পূর্বে নদীবহুল সবুজ প্রান্তর—এই

প্রাকৃতিক পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে এখানকার বিচিত্র মানুষেরা—এবং পশ্চিমবঙ্গের বাহির হইতেও, যেমন বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যভারত প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্য হইতেও লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য এখানে আসিয়াছে এবং বিভিন্ন উৎপাদনে অংশগ্রহণ করিয়াছে।

কলিকাতা সহ ১৬টি জেলার জনবসতির ঘনত্ব একই রকম নহে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে গড়ে ৩৯৪ জন মানুষ বাস করে কিন্তু ইহার ভিতর গ্রাম ও শহর এলাকার জনবসতির ঘনত্বের তফাত আছে। শহরের জনবসতির ঘনত্ব গ্রামের তুলনায় অনেক বেশী। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় জনবসতির ঘনত্ব কম; মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগনায় ঘনত্ব বেশী। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ শহরাঞ্চলে বসবাস করে—তাহার ভিতর সর্বাপেক্ষা জনবহুল শহর কলিকাতা ও হুগলী নদীর উভয় তীরে শিল্প-শহরগুলি। সম্প্রতিকালে আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান, শিলিগুড়ি ও খড়্গাপুর অঞ্চলে নূতন নূতন শিল্পে শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়াতে এইসব স্থানের জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ৫০ লক্ষের উপর শরণার্থী পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে।

বাঙালীদের চেহারা ও শারীরিক গঠনে বিভিন্ন জাতির ছাপ আছে। অনুমান করা হয়, দ্রাবিড়, মঙ্গোল ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির উদ্ভব হইয়াছে। উত্তরাঞ্চলে পাহাড়িয়া জাতিদের ভিতর লেপচা, তিব্বতী, ভুটিয়া ও নেপালীরা বসবাস করে। রাজ্যের

বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমদিকে অনেক আদিবাসী বাস করে—ইহাদের ভিতর সাঁওতালরাই প্রধান। সাঁওতাল ছাড়া



নেপালী



রাজবংশী

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে মুণ্ডা, রাজবংশী, লোধা ও ওরাওঁদের দেখা যায়। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় লোধা নামে অধিবাসী অনেক



সাঁওতাল



লোধা

দেখা যায়। কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে রাজবংশী নামে আদিবাসীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে বেশী

মানুষ বাস করে। শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ বিভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া থাকে। রাজ্যের বাহির হইতে যাতায়াত করিলেও অন্য রাজ্যের অনেক মানুষ পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে বাস করিতেছে। বাঙালীদের ভিতর বর্ণহিন্দু ছাড়া অনেক তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ আছে। ধর্মীয় দিক হইতে হিন্দুরা ছাড়া অনেকেই ইসলামধর্মভুক্ত। পাহাড়িয়া জাতিদের ভিতর বেশীর ভাগ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

মানুষের খাদ্য, পরিধান, বাসস্থান ও উপজীবিকার উপর নিবিড়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাহার পরিবেশ। অনুরূপভাবে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' ঘনিষ্ঠভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে পশ্চিম-বঙ্গের মানুষের জীবনধারা।

খাদ্য

পশ্চিমবঙ্গের পলিগঠিত উর্বর মাটিতে প্রচুর পরিমাণে ধানের ফলন হয়। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে আউশ, আমন ও বোরো প্রভৃতি নানাবিধ ধান উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে এই রাজ্য নদীমাতৃক—অসংখ্য নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর, জলাশয় চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। বর্ষাকালে প্রবল বর্ষণে সব স্থান জলে ভরিয়া উঠে এবং অনেক ক্ষেত্রেই বর্ষার পরে জল জমা হইয়া থাকে। এইসব জলে প্রচুর পরিমাণে মাছের চাষ হয়। তাই খাদ্য হিসাবে **ভাত ও মাছ** পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। ধান হইতে **চিড়া, মুড়ি, খই** প্রভৃতি অন্যান্য খাদ্য প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। অনেক অঞ্চলে মুড়ি খুব প্রিয় খাদ্য। কৃষিজাত দ্রব্যের ভিতর নানাপ্রকার **ডাল ও শাকসবজি** ব্যাপকভাবে প্রতিদিনকার খাদ্য হিসাবে সংগ্রহ করা

হয়। তৈলজাত পদার্থের মধ্যে **সরিষার তৈল** প্রধান। গ্রীষ্মকালে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই সময়ে কোন কোন অঞ্চলে অনেকে **আম ও কাঁঠাল** খাদ্যের প্রধান অংশ হিসাবে গ্রহণ করে। **দুগ্ধজাত দ্রব্য** পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে খুব প্রিয় প্রায় প্রতি শহরে, গঞ্জে মিঠাইএর দোকান দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতিকালে দেশবিভাগের পর উর্বর কৃষিজমি ও মৎস্যচাষের প্রসিদ্ধ জলাশয়ের বেশীর ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলিয়া গিয়াছে। তাই ভাত ও মাছ প্রধান খাদ্য হইলেও ইহাদের দুষ্প্রাপ্যতা প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হইতেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ভাতের পরিবর্তে প্রায় সকলেই আংশিক খাদ্য হিসাবে **রুটি** খাইয়া থাকে। পূর্বের তুলনায় এই রাজ্যে গমের চাষ অনেক বাড়িয়াছে। মাছের অভাব খুব বেশী—তাই সকলে মাছ খাইতে পারে না। প্রধান নদী ভাগীরথীর তীরে প্রচুর শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে—এবং জল দূষিত হওয়ায় মাছের চাষ এই নদীতে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু গ্রীষ্মপ্রধান—এবং এখানকার মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ গরম দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী তৈয়ারী হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সূতী বস্ত্র ব্যবহার করে। পোশাকের প্রাচুর্য খুব বেশী নাই। গ্রামের চাষীরা খাটো ধুতি পরে—অধিকাংশ সময়ে খালি গায়ে থাকে। কখনও কখনও ফতুয়ার মত জামা পরে—চাদর ব্যবহার করে। বিত্তবান মানুষেরা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরে—চাদর ব্যবহার করে। মেয়েরা শাড়ী ও ব্লাউজ পরে—গহনা পরিতে ভালবাসে।

আদিবাসীদের ভিতর স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বড় বড় চুল রাখে—গহনা



পুরাতন পোশাকে বাঙালী পুরুষ



সাধারণ পোশাকে বাঙালী মহিলা

পরে। পাহাড়িয়া মানুষেরা খুব আঁটসাঁট পায়জামা ও কামিজ পরে—ইহাতে উঁচু-নীচু জায়গায় চলাফেরা করা, কাজকর্ম করা যায় সহজভাবে। পশ্চিমবঙ্গে টুপি বা পাগড়ির প্রচলন খুব কম। এখানে শীত খুব কম বলিয়া একমাত্র দার্জিলিংএর পাহাড় অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র পশমী জামা-কাপড় খুব কম মানুষই ব্যবহার করে।



আধুনিক পোশাকে বাঙালী পুরুষ ও মহিলা

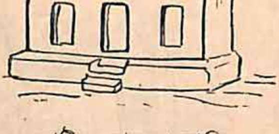
বর্তমানকালে অনেকস্থানে বিশেষ করিয়া শহরাঞ্চলে পোশাকের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। **শহরাঞ্চলে** মানুষের চলাফেরার গতি খুব বেশী এবং অত্যধিক ভিড়। সব দিক

হইতে সুবিধার জন্য বেশীর ভাগ লোক প্যাণ্ট বা শার্ট পছন্দ করে।

মনে রাখা দরকার, **পোশাক-পরিচ্ছদ ভৌগোলিক পরিবেশ ছাড়াও মানুষের অভ্যাস ও কৃষ্টির উপর কিছুটা নির্ভর করে।** পৃথিবীর প্রায় সব স্থানে বর্তমানকালে প্যাণ্ট ও শার্টের ব্যাপকভাবে প্রচলন হইয়াছে। মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদেও অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে। পুরুষদের ভিতর অনেকেই প্যাণ্ট ও শার্ট পরে। গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষিত লোকেদের ভিতর প্যাণ্টের প্রচলন হইতেছে। কিন্তু পরিবর্তন হইলেও সব স্থানেই নিজ নিজ জাতীয় পোশাক মানুষ পরে যে-কোনও উৎসবে বা পূজাপার্বণে।

বাসস্থান

মানুষ প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা (রৌদ্রের প্রখরতা, বৃষ্টির প্রবলতা প্রভৃতি) হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদাই



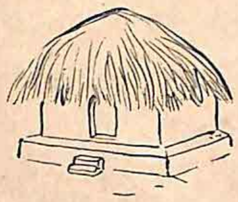
মাটির দোতলা বাড়ি



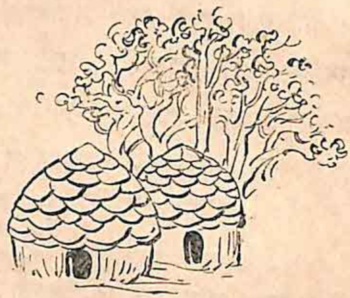
পার্বত্য অঞ্চলের বাড়ি

সুদৃঢ় এবং স্বাস্থ্যপ্রদ ঘর বানাইবার চেষ্টা করে। প্রকৃতি হইতে খাদ্য যেমন সংগৃহীত হয় তেমনই বাসস্থান নির্মাণের উপকরণও সংগৃহীত হয় চারিপাশের পরিবেশ হইতে।

পশ্চিমবঙ্গের বনে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ও কাঠ পাওয়া যায়—তাই বাঁশ বা কাঠ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে। ছন বা খড় চাল নির্মাণের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়। এঁটেল বা বেলে মাটিকে প্রভূত পরিমাণে কাজে লাগানো হয় ঘরের দেওয়াল তৈয়ারির ব্যাপারে। **বাঁশ** বা **কাঠের খুঁটি, বাঁশের চাটাইএর** বেড়া ও তাহার উপর **মাটির প্রলেপ** এবং **ছন** বা **খড়ের** ছাউনি—এই ধরনের ঘর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হয় বলিয়া সব সময়ই



ছনের ছাউনি



পাতার ঘর

ছাউনি চারিদিকে ঢালু রাখা হয় এবং মাটির দেওয়াল সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত রাখা হয়।

মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় পুরু মাটির দেওয়াল দেওয়া হয় এবং অনেক মাটির বাড়ি দোতলা হয়। অন্যত্র বাঁশের ব্যবহারই বেশী। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় অনেকস্থানে **কাঠের পাটাতন** করিয়া তাহার উপর



টিনের ঘর

ঘর তৈয়ারি করা হয়। বিত্তবান্ লোকেরা বহুক্ষেত্রে **টিনের ঘর** বা **পাকা দালানে** বাস করে। শহরাঞ্চলে পাকা দালান

বেশী, আবার দক্ষিণাঞ্চলে অনেকে হোগলা এবং গোলপাতার ঘরে বাস করে।

উপজীবিকা

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা বেশীর ভাগ গ্রামে বাস করে। অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় এখানকার গ্রামগুলি অনেক বড় এবং এখানে কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য অনেক বৃত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। **কৃষিই** মানুষের প্রধান উপজীবিকা। অন্যান্য বৃত্তিধারীর ভিতর উল্লেখ করা যাইতে পারে—**কামার, কুমার, মাঝি,** ছোট ও বড় **ব্যবসাদার, তাঁত-শিল্পে** নিয়োজিত মানুষ। কৃষকদের ক্ষেতের কাজ যখন থাকে না তখন তাহাদের কিছু অংশ অন্যান্য কাজের সন্ধান করে। **রাস্তাঘাট**



মাঝি



কারখানার শ্রমিক



চা বাগানের শ্রমিক

নির্মাণ, গৃহনির্মাণ বা **মেরামত** প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে।

বনজ সম্পদ সংগ্রহ করিয়া এবং **মাছ ধরিয়া** অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

পশ্চিমবঙ্গে অন্য রাজ্যের তুলনায় কলে কারখানায় অনেক **শ্রমিক** নিয়োজিত আছে। খনি অঞ্চলে ও চা বাগানে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ করে। যানবাহন শিল্পে সম্প্রতিকালে অনেক বেশী মানুষ নিযুক্ত হইয়াছে।

শ্রমজীবী ছাড়া **বুদ্ধিজীবীর** পেশা অনেকের আছে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে **শিক্ষক, আইনজীবী** ও অফিসের **কেরানীই** প্রধান। শিল্পবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণে বুদ্ধিজীবীদের অনেক নূতন নূতন পেশার উদ্ভব হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে এত ছোট কিন্তু জনবসতি এত বেশী কেন ?

২। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ শহরগুলিতে মানুষের ভিড় সম্প্রতিকালে বাড়িয়াছে এবং কেন ?

৩। নিম্নলিখিত আদিবাসীরা কোন্ অঞ্চলে বাস করে, পাশে লিখিয়া দাও :—

সাঁওতাল—

রাজবংশী—

মুণ্ডা—

ওরাওঁ—

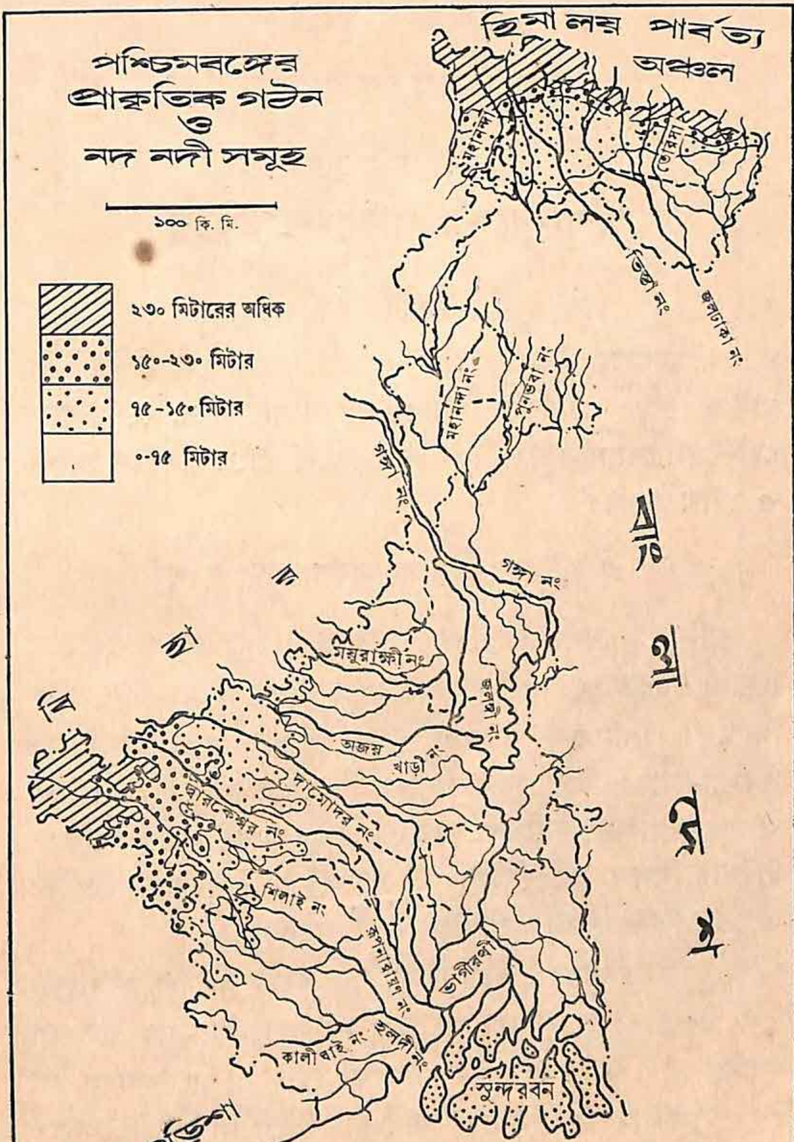
৪। ভাত ও মাছ বাঙালীর প্রধান খাদ্য কেন ?

৫। পশ্চিমবঙ্গে মাছের চাষের কি কোন অসুবিধা দেখা দিয়াছে ?

৬। পাহাড়িয়া মানুষেরা আঁটসাঁট কাপড় কেন পরে ?

৭। পশ্চিমবঙ্গে বাসস্থানের প্রধান প্রধান উপকরণ কি ?

৮। কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গে কি কি প্রধান বৃত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে ?



পশ্চিমবঙ্গের
প্রাকৃতিক গঠন
ও
নদ নদী সমূহ
১০০ কি. মি.
২৩০ মিটারের অধিক
১৫০-২৩০ মিটার
৭৫-১৫০ মিটার
০-৭৫ মিটার
হিমালয় পার্বত্য
অঞ্চল
তিস্তা নং
জলঢাকা নং
মহানন্দা নং
পুনর্ভবা নং
গঙ্গা নং
গঙ্গা নং
বাংলাদেশ
বিহার
ময়ূরাক্ষী নং
অজয়
খাড়ী নং
দামোদর নং
দ্বারকেশ্বর নং
শিলাই নং
রূপনারায়ণ নং
ভাগীরথী
হলদী নং
সুন্দরবন
ওড়িশা
বঙ্গোপসাগর

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ-পরিচয়

ভূ-প্রকৃতি

পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যাইতে পারে : (১) উত্তরে হিমালয় পর্বতমালার অংশ, (২) পশ্চিমে ঢেউ-খেলানো মালভূমি, (৩) পূর্বে (অবশিষ্টাংশ) বিস্তীর্ণ সমভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চল।

(১) উত্তরে হিমালয় পর্বতমালার অংশ

দার্জিলিং জেলা সম্পূর্ণভাবে হিমালয়ের নিম্ন অংশে অবস্থিত। হিমালয় পর্বত এই অংশে সমভূমি হইতে হঠাৎ অনেক উচ্চ হইয়া গিয়াছে। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে ২৪ কিলোমিটারের ভিতর বেশ উচ্চ অঞ্চল দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে শৈলাবাস **দার্জিলিং শহর** ২১৩৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। **টাইগার হিল** (২৬১৫ মিটার), **ঘুম** (২৩৯৮ মিটার) প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট শৃঙ্গ দার্জিলিংএর নিকট আছে।

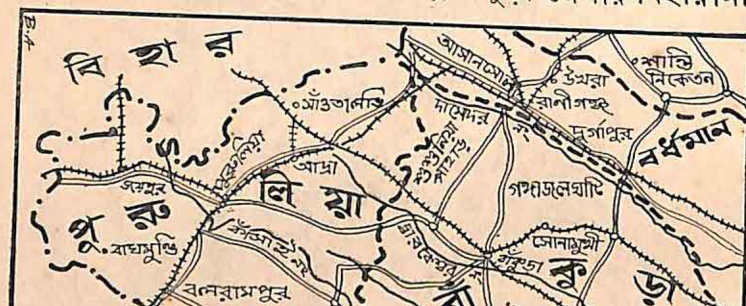
এই পার্বত্যভূমির উচ্চতা দক্ষিণদিকে ক্রমেই কমিয়া আসিয়াছে এবং পর্বত হইতে অসংখ্য খরস্রোতা নদী প্রচুর পরিমাণে প্রস্তরখণ্ড আনিয়া জমা করিয়াছে—এই অঞ্চলকে 'তরাই' বা ডুয়ার্স অঞ্চল বলা হয়। জলপাইগুড়ির উত্তরে ডুয়ার্স ঘন জঙ্গলে আবৃত এবং আরও উত্তরে **সিঞ্চুলা পাহাড়**।



(২) পশ্চিমে ঢেউ-খেলানো মালভূমি

এই মালভূমি বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমির প্রলম্বিত অংশ। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ এই ভূ-প্রকৃতির অন্তর্গত। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় রাজমহল

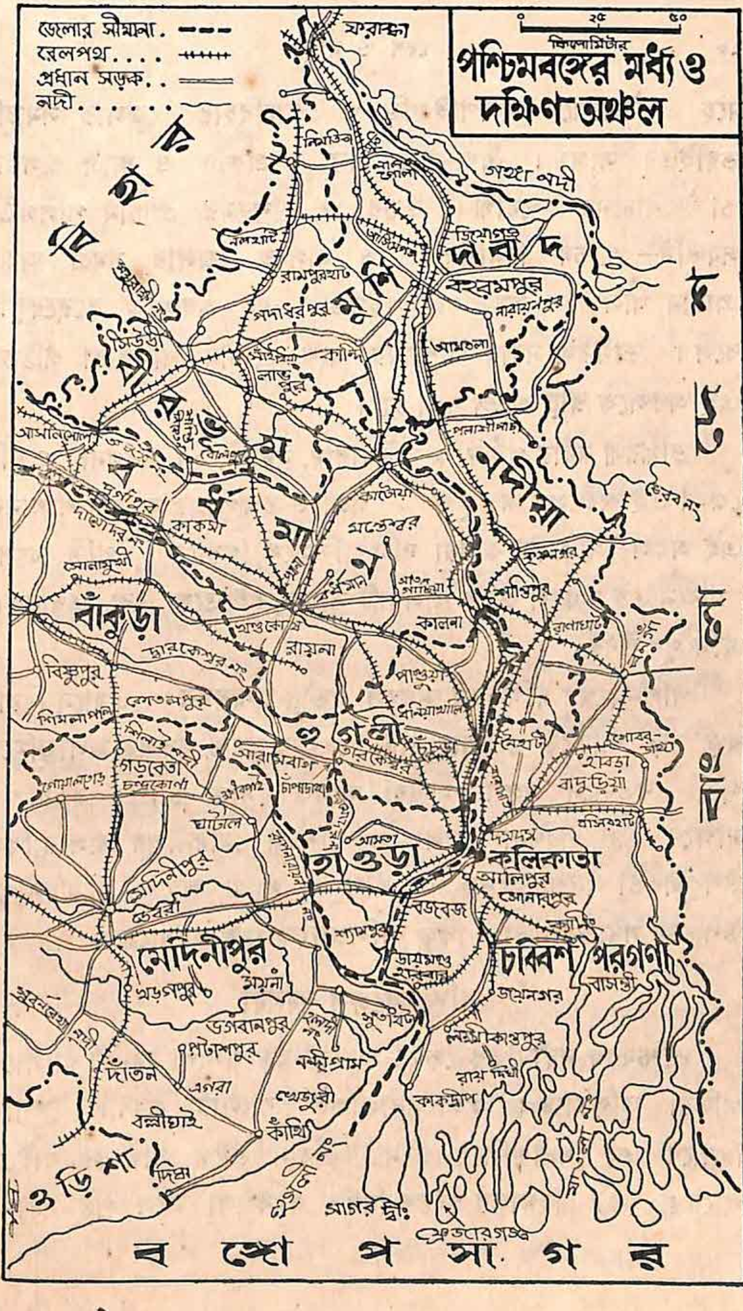
পাহাড় কিছুটা বিস্তৃত হইয়াছে। পশ্চিম মালভূমিতে কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড় বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়া আছে। তাহাদের মধ্যে পুরুলিয়া জেলায় **বাঘমুণ্ডি** (৬৭৭ মিঃ), বাঁকুড়া জেলায় **বিহারীনাথ**



পাহাড় (৪৫২ মিঃ) ও **শুশুনিয়া** (৪৪২ মিঃ) এবং অনেক মাটির ঢিবি চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। এই মালভূমি বহু যুগ আগে সবচেয়ে পুরাতন শিলাদ্বারা গঠিত।

(৩) পূর্বে বিস্তীর্ণ সমভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চল

উত্তর ও পশ্চিমের কিছু অংশ বাদ দিলে আর সমস্ত অংশই সমভূমি বা বদ্বীপের অন্তর্গত। এই সমভূমির প্রকৃতি সর্বত্র একরকম



পশ্চিমবঙ্গের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল
০ ২৫ ৫০
কিলোমিটার
জেলার সীমানা
রেলপথ
প্রধান সড়ক
নদী
বিহার
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
বর্ধমান
নদীয়া
বাঁকুড়া
হুগলী
হাওড়া
কলিকাতা
মেদিনীপুর
চব্বিশ পরগণা
ওড়িশা
বঙ্গোপসাগর
ফরাক্কা
গঙ্গা নদী
বহরমপুর
সিউড়ী
আসানসোল
দুর্গাপুর
কাটোয়া
কৃষ্ণনগর
শান্তিপুর
কালনা
বিষ্ণুপুর
আলিপুর
খড়গপুর
কাঁথি
দীঘা
কাকদ্বীপ
সাগর দ্বীপ

নহে উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার সমভূমি তরাইএর সংলগ্ন। এখানকার ঢালু ভূ-প্রকৃতি ও আর্দ্র জলবায়ু চা উৎপাদনের উপযোগী। উত্তর ও পশ্চিমের প্রাচীন পলিগঠিত সমভূমি—পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলার সমগ্র অঞ্চল প্রাচীন পলিগঠিত সমভূমির অন্তর্গত। এই অঞ্চলকে **বরেন্দ্রভূমি** বলে। ভাগীরথী নদীর পশ্চিমের অংশ প্রাচীন পলিদ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলকে **রাঢ়** অঞ্চল বলা হয়।

ভাগীরথী নদীর পূর্বদিকে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অসংখ্য শাখানদী এই অঞ্চল অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে প্রতি বৎসর প্লাবনে এই অঞ্চলে প্রচুর পলিমাটি সঞ্চিত হইতেছে এবং এখানকার জমি খুব উর্বর।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণতম অঞ্চলে গভীর **সুন্দরবন**। এখানে বিরাট বড় বড় খাড়িতে জোয়ার-ভাঁটা খেলায় সমস্ত অঞ্চলই জলাভূমিতে পূর্ণ বর্তমানে জঙ্গল কাটিয়া অনেক বসতি স্থাপিত হইয়াছে। দক্ষিণে ২৪ পরগনা জেলা ও পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার কিছু উপকূলবর্তী অংশে অনেকগুলি দ্বীপ ও খাড়ি আছে। মেদিনীপুর উপকূলে সমান্তরালভাবে কিছু **বালিয়াড়ির** সৃষ্টি হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের নদনদী

পশ্চিমবঙ্গ নদীমাতৃক দেশ। ছোট-বড় অসংখ্য নদনদী বাংলাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এই নদীগুলিই বাংলার প্রাণ। উৎপত্তি হিসাবে এই নদীগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারেঃ (ক) হিমালয় হইতে নির্গত বরফগলা জলে পুষ্ট নদী—

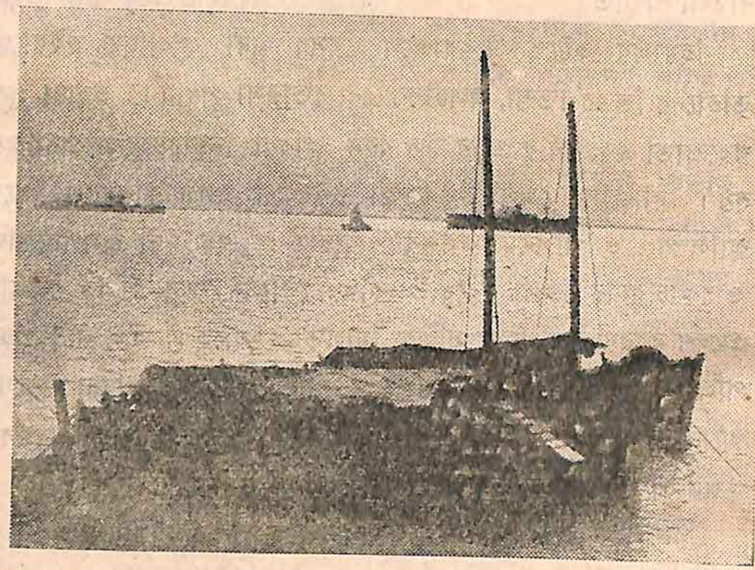
যেমন, গঙ্গা, তিস্তা এবং অসংখ্য শাখা-প্রশাখা, (খ) বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী—যেমন, দামোদর, অজয় প্রভৃতি, (গ) কিছু নদীতে নিয়মিতভাবে জোয়ার-ভাঁটা খেলে—যেমন, পিয়ালি, বিদ্যাধরী, মাতলা প্রভৃতি।

হিমালয় হইতে উত্তরাঞ্চলে যেসব নদী প্রবাহিত হইয়াছে তাহাদের ভিতর **তিস্তা**, **জলঢাকা** এবং **তোরসা** প্রধান। ইহারা খুব খরস্রোতা এবং বর্ষায় প্রচুর জল বহন করিয়া নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয়। দার্জিলিং জেলাকে তিস্তা দুইভাগে ভাগ করিয়াছে—পূর্বে কালিম্পং ও পশ্চিমে কার্শিয়াং পাহাড়। এই নদী জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা বিধৌত করিয়া বাংলাদেশের রংপুর জেলায় প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদী প্রচুর পলি বহন করিয়া আনে এবং প্রায়ই বন্যার সৃষ্টি করিয়া মানুষের অনেক দুঃখ-দুর্দশা ঘটায়। অন্যান্য নদীর ভিতর মহানন্দা, পুনর্ভবা, তঙ্গন প্রভৃতি নদী দক্ষিণাভিমুখে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

গঙ্গানদী উত্তর ভারতে হিমালয় হইতে বাহির হইয়া উত্তর প্রদেশ ও বিহারের ২০৮০ কিলোমিটার জনপদ অতিক্রম করিয়া মালদহের নিকট পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে মালদহ ও মুর্শিদাবাদের সীমা রক্ষা করিয়া ১৯ কিলোমিটার প্রবাহিত হইবার পর মুর্শিদাবাদের সহিত বাংলাদেশের ৯৭ কিলোমিটার সীমানা অতিক্রম করিয়া **পদ্মা** নাম ধারণ করিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং আরও নিম্নে **ব্রহ্মপুত্র** ও **মেঘনার** সহিত মিলিত হইয়া সাগরাভিমুখে গিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার নিকট ইহার শাখানদী **ভাগীরথী** পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে বিলীন হইয়াছে। ভাগীরথী প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের জীবনরেখা। এই

নদীর উভয় পার্শ্বে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, শিল্প ও জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভৈরব, জলঙ্গী প্রভৃতি আরও কয়েকটি শাখানদী গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এইসব নদী



পশ্চিমবঙ্গের জীবনরেখা ভাগীরথী

নিম্নভাগে আরও অনেক ভাগে ভাগ হইয়াছে। চূর্ণী, মাথাভাঙ্গা, গোসাবা, রায়ঢাক ও ইছামতী তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে ছোটনাগপুর মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া অনেকগুলি নদী পূর্বগামিনী হইয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ ও কাঁসাই প্রধান। ব্রাহ্মণী ও ময়ূরাক্ষী পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া বীরভূম জেলার ভিতর দিয়া আসিয়া ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। অন্যদিকে দামোদর, রূপনারায়ণ ও কাঁসাই কলিকাতার দক্ষিণে ভাগীরথীর সহিত

মিলিত হইয়াছে। এইসব নদী বর্ষাকালে প্রচুর জল বহন করিয়া ভাগীরথীকে পুষ্ট করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বালি, কাঁকর, মাটি আনিয়া ক্রমশ ই ভাগীরথীর গর্ভ ভরাট করিতেছে। **সুবর্ণরেখা** নদীর কিয়দংশ মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কাঁসাই নদীতে প্রতি বৎসর বন্যা হয়—বর্তমানে একটি বন্যা-নিরোধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাদেশের নদীগুলি বহুবার পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন খাতে, আবার নূতন খাত ছাড়িয়া নূতনতর খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। সহসা খাত পরিবর্তনের জন্য অনেক শহর, বন্দর, জনপদ, উর্বর প্রান্তর, মানুষের কীর্তি ধ্বংস হইয়াছে, আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। নদীকে অনুসরণ করিয়া নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে ভাগীরথী নদী ভরাট হইয়াছে—তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছে ফরাক্কা বাঁধ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে।

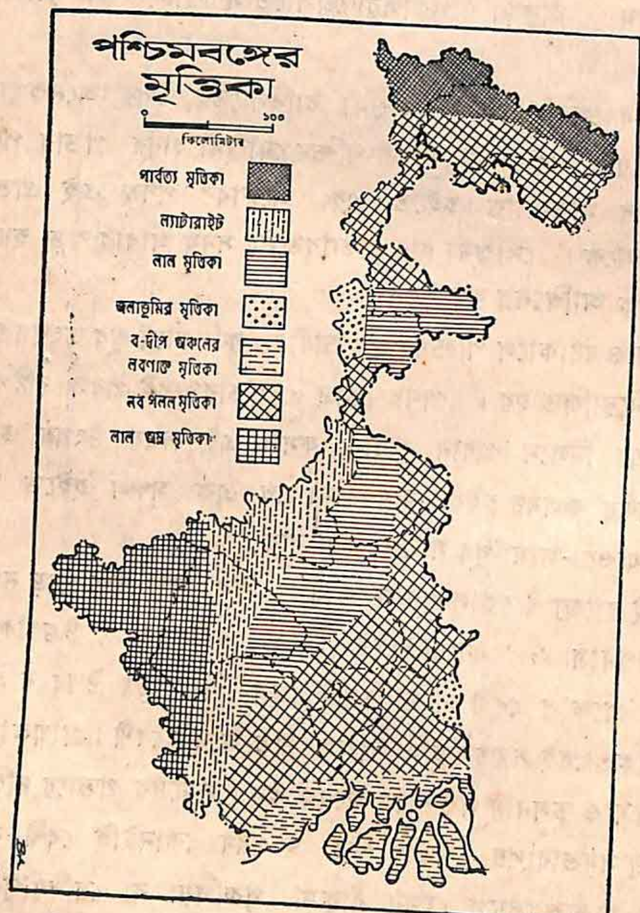
পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু

এক কথায় বলিতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র এবং ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এপ্রিল হইতে গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হয় এবং মে মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। গড়ে তাপমাত্রা ৮০° ফারেনহাইট (২৬·৭° সেন্টিগ্রেড) হইতে ১১০° ফা. (৪৩·৩° সে.) পর্যন্ত ওঠে। দার্জিলিং জেলায় উচ্চতার জন্য তাপ খুব বেশী ওঠে না। সামুদ্রিক প্রভাবে দক্ষিণ অংশে জলবায়ু কিছুটা সমভাবাপন্ন। এপ্রিল-মে মাসে উত্তাপ যথেষ্ট পরিমাণে থাকাতে প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হয়। এই

ও গরম দুই-ই বেশী। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না বলিলেই চলে। তাই জলসেচের সাহায্যে নানারূপ রবিশস্য (শীতকালীন শস্য) ফলানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা

ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই



উপাদান মৃত্তিকা গঠনে অনেকখানি সাহায্য করে। পশ্চিমবঙ্গে

মৃত্তিকাকে সাধারণতঃ চারিভাগে ভাগ করা যায়। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে **পার্বত্য মৃত্তিকা** সাধারণতঃ বাদামী রঙের হয়। ডুয়ার্স অঞ্চলের এই মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। ডুয়ার্সের উচ্চভূমিতে **লৌহমিশ্রিত কাদামাটি** চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম এবং পুরুলিয়ার মৃত্তিকা **কাঁকরমিশ্রিত লালমাটি** (ল্যাটারাইট)। এইসব স্থানে কৃষি যথেষ্ট উন্নত নহে। এই মৃত্তিকায় লৌহের অংশ বেশী আছে বলিয়া লাল রং হয়। সমভূমিতে **উর্বর পলিমাটি** দেখা যায়। হাওড়া, ২৪ পরগনা, হুগলী জেলার পূর্বাংশ, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলা **নব পললে** গঠিত। অপরদিকে ২৪ পরগনা জেলার উত্তর-পূর্ব অংশ, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের পশ্চিম অংশ প্রাচীন পললে গঠিত। উত্তরবঙ্গের সমভূমিও **প্রাচীন পললে** গঠিত। দক্ষিণের সুন্দরবন অঞ্চলে **লবণাক্ত মৃত্তিকার** প্রাধান্য আছে। পলিমাটিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—বেলেমাটি (বালির আধিক্য), কাদামাটি (কাদার আধিক্য) এবং দোআঁশ মাটি (বালি ও কাদার সংমিশ্রণ)। দোআঁশ মাটিতে ধান, গম, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বেলেমাটিতে আউশ ধান খুব ভাল জন্মে। **মৃত্তিকার মৌলিক গুণাবলীর উপর কৃষিকার্য বিপুলভাবে নির্ভর করে।**

অনুশীলনী

১। পশ্চিমবঙ্গের একখানি মানচিত্র আঁকিয়া তাহাতে রেখা-দ্বারা বিশেষ বিশেষ ভূ-প্রকৃতিকে দেখাও।

২। পশ্চিমবঙ্গের সমভূমিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

৩। "পশ্চিমবঙ্গ নদীমাতৃক দেশ"—এই উক্তি কেন করা হয়?

৪। ভাগীরথী নদীর একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া উহার শাখানদী ও উপনদী-গুলি দেখাও।

৫। পশ্চিমবঙ্গে কোন্ কোন্ নদীতে প্রায় প্রতি বৎসরই বন্যা হয়? বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কি উপায় আছে?

৬। নিম্নলিখিত নদীগুলির উৎপত্তিস্থল ও মিলনস্থল কোথায় বল :—
তোরসা, কাঁসাই, দামোদর, জলঙ্গী, ইছামতী, অজয়।

৭। ভাগীরথী নদীর বর্তমান সমস্যা কি? তোমার মতে এই সমস্যাকে কিভাবে সমাধান করা যায় বল।

৮। পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

৯। কালবৈশাখী ও আশ্বিনের ঝড় কাহাকে বলে?

১০। পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের উৎপন্ন দ্রব্য

মানুষ উন্নততর জীব। প্রাকৃতিক পরিবেশে বহুবিধ সম্পদ আছে। বাঁচিবার তাগিদে অন্য জীবজন্তু যেখানে যে অবস্থায় আহার সংগ্রহ করিতে পারে তাহার দ্বারাই জীবনধারণ করে। নির্দিষ্ট স্থানে আহার ফুরাইয়া গেলে অন্যত্র চলিয়া যায়; প্রকৃতির সম্পদকে নিজের করায়ত্ত করিতে কখনই সক্ষম হয় না। জন্তু-জানোয়ারের গতিবিধি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হইলেও প্রকৃতিকে সে নিজের বশে আনিতে পারে—তাহার বুদ্ধিবলে। প্রকৃতিতে বহুবিধ সম্পদ আছে। **মানুষ স্বীয় বুদ্ধি ও বহু যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রকৃতির সম্পদকে আহরণ করিয়া নানাভাবে কাজে লাগাইতে সক্ষম হইয়াছে।** সে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নানাবিধ ফসল ফলাইতে শিখিয়াছে, বনজ সম্পদ আহরণ করিয়া বাসস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে, মাটি খুঁড়িয়া মূল্যবান ধাতব পদার্থ সংগ্রহ করিয়াছে। এই সম্পদকে কাজে লাগাইয়া সমাজকে অনেক উন্নত স্তরে লইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ নানা সম্পদে পূর্ণ। 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' এই বঙ্গ-দেশের নানাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নানাবিধ দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম উৎপন্ন দ্রব্যগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল:

বনজ সম্পদ

মানুষের সভ্যতা বিকাশে বনজ সম্পদের দান অতুলনীয় আদিমকাল হইতে মানুষ বন হইতে নানারূপ খাদ্য সংগ্রহ

করিয়াছে—বনের কাঠ কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছে, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়াছে। বর্তমান কালেও বনজ সম্পদ অব্যাহত গতিতে মানুষের উপকার করিয়া আসিতেছে। বাড়িতে উনুনে আগুন দেওয়া হইতে শুরু করিয়া শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বত্রই বনজ পদার্থের কথা স্মরণ করিতে হয়। তাহা ভিন্ন, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ভূমিক্ষয়কে রোধ করে, বায়ুর আর্দ্রতা বাড়ায় এবং স্থানীয়ভাবে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। সুতরাং বিজ্ঞানসম্মতভাবে বন সংরক্ষণ করা একান্তভাবে কর্তব্য।

পশ্চিমবঙ্গে মোট জমির শতকরা ১৪ ভাগ জমিতে বন আছে—ইহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এই রাজ্যের ছয়টি জেলায় বনাঞ্চল নাই বলিলেই চলে। আঞ্চলিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চলকে নিম্নরূপ ভাগ করা যাইতে পারে:

(১) দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় পার্বত্য অঞ্চলে সরল-বর্গীয় বনভূমি,

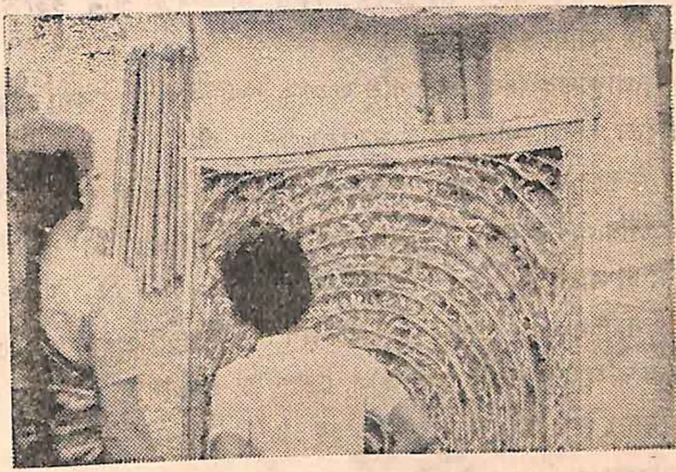
(২) পর্বতের সানুদেশে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় চিরহরিৎ বনাঞ্চল,

(৩) রাজ্যের পশ্চিম সীমানায় ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির দক্ষিণভাগে পাতাঝরা (পর্ণমোচী) বনভূমি,

(৪) চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণে সুন্দরবন (উপকূলীয় বনভূমি)।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বন হইতে অনেক কাঠ সংগ্রহ করা হয়। ইহার মধ্যে শাল, স্প্রুস, বাবলা, শিশু, সেগুন, সুন্দরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবন হইতে গরান, গেঁওয়া, হেঁতাল, কেওড়া ত্যাদি কাঠ সংগ্রহ করা হয় শিল্পগঠন, গৃহনির্মাণ ও রেলপথের

জন্য। পশ্চিমবঙ্গের চাহিদার তুলনায় কাঠের উৎপাদন অনেক কম—তাই বাহির হইতে উহা আমদানি করা হয়। সরলবর্গীয় অরণ্য হইতে **কাগজ ও দিয়াশলাই** শিল্পের জন্য নরম কাঠ সংগৃহীত হয়। হিমালয় অরণ্য, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া এবং সুন্দরবন হইতে বহুবিধ **ভেষজ উদ্ভিদ** সংগ্রহ করা হয়। **লাক্ষা, রং, তারপিন** প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদ ও মালদহে



রেশমকীট তৈয়ারির পদ্ধতি

রেশম-শিল্পের জন্য তুত গাছের চাষ হয়। সুন্দরবন অঞ্চল হইতে মোম, মধু ও হোগলা পাতা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গে বনসংরক্ষণের প্রতি আরও নজর দেওয়া হইতেছে।

কৃষিজ সম্পদ

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে। পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ কৃষিতে নিযুক্ত আছে। এখন পর্যন্ত কৃষিই এদেশে মানুষের প্রধান উপজীবিকা। কিন্তু পূর্বের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে এবং চাষ করিবার প্রথায় বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি না হওয়ায় সমস্ত মানুষ খাদ্য ঠিকমত পায় না—অন্য স্থান হইতে চাল বা গম আনিতে হয়।

প্রাকৃতিক দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পার্বত্য অঞ্চল, মালভূমি ও সমতলভূমি।

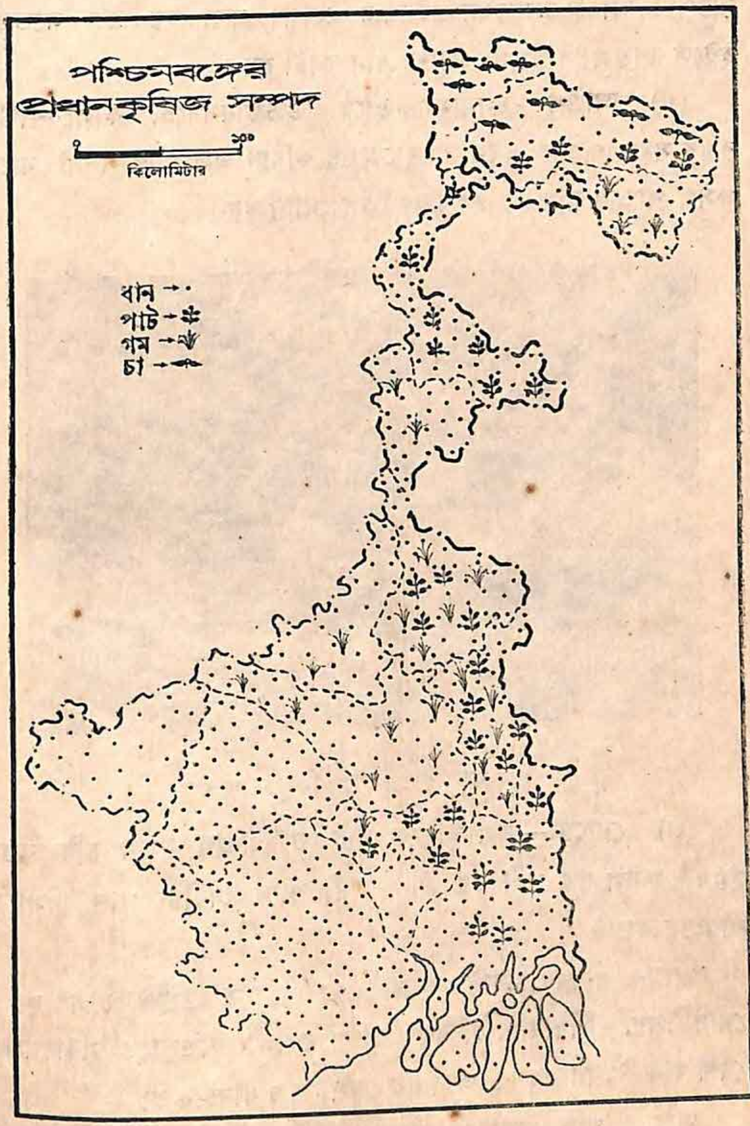
উত্তরে তরাই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। চা এই অঞ্চলের প্রধান ফসল। ভারত ও ভারতের বাহিরে **চা** রপ্তানী হয় এবং চা মারফত অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আসে।

সমতলভূমির প্রধান ফসল **ধান**। অন্যান্য প্রধান কৃষিদ্রব্যের মধ্যে রহিয়াছে **পাট**, কিছু ডাল, তৈলবীজ ও **তামাক**। ডাল উত্তর প্রদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়।

ধান : ধান মৌসুমী দেশের ফসল। ধান ফলনের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের প্রয়োজন। ১১৪ সেমি.র কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে জলসেচ মারফত ধান উৎপাদন করা হয়। উর্বর পলিমাটি ধান উৎপাদনের এক বিশিষ্ট উপাদান। নদীর বদ্বীপ ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে ধানের ফলন বেশী হয়।

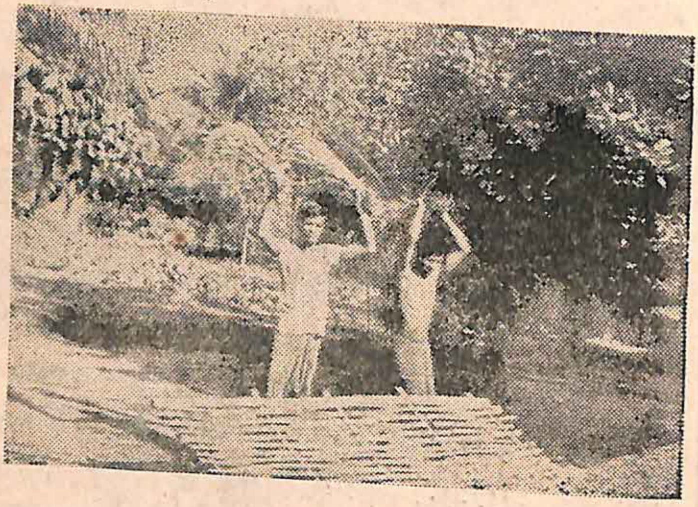
পশ্চিমবঙ্গে সারা বৎসরে তিনপ্রকারের ধান জন্মে :

(ক) **আমন**—জুন হইতে অগস্ট মাসের ভিতর যখন মৌসুমী


পশ্চিমবঙ্গের
প্রধান কৃষিজ সম্পদ
কিলোমিটার
ধান
পাট
গম
চা

বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয় তখন এই ধান রোপণ করা হয় এবং নভেম্বর হইতে জানুআরি মাসের ভিতর ধান কাটা হয়।

(খ) **আউশ**—তুলনামূলকভাবে উচ্চস্থানসমূহে কালবৈশাখীর বৃষ্টির সময় এপ্রিল ও মে মাসে রোপণ করিয়া জুলাই ও অগস্ট মাসে ফসল পাওয়া যায়। এই চাল কিছু মোটা হয়।



ধান ঝাড়াই-এর কাজে নিযুক্ত কৃষক

(গ) **বোরো**—জলাভূমিতে মার্চ ও এপ্রিল মাসে চাষ করা হয়। ফসল খুব বেশী হয় না—স্থানীয়ভাবে চাষীরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে।

আমন ধানই প্রধান ফসল এবং ইহাতে উৎকৃষ্ট চাল হয়। মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগনা, হুগলী, হাওড়াতে সর্বাপেক্ষা বেশী ধান উৎপন্ন হয়। অন্য সব জেলাতেও ধানচাষ হয়।

অন্যান্য খাদ্য ফসলের ভিতর **ইক্ষু, ভুট্টা, যব, ডাল** বিভিন্ন

জেলায় উৎপন্ন হয়। 'বর্তমানে জলসেচের সুবিধা হওয়ায় কোন কোন স্থানে গম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। শীতকালীন শস্য হিসাবে ডাল মুর্শিদাবাদে বেশী হয়। গম, ভুট্টা প্রভৃতি শীতকালীন শস্য হিসাবে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাঢ় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গে **জাপানী প্রথায়** বহু স্থানে ধান চাষ হইতেছে। চিরাচরিত ধান (আমন, আউশ ও বোরো) ছাড়াও 'আই-আর', 'তাইচুং' প্রভৃতি বহুপ্রকারের ধান উৎপন্ন হইতেছে। অবশ্য এইসব ধান গুণগতভাবে কিছুটা নিকৃষ্ট।

পাট ঃ কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ধানের পরই



পাটক্ষেত

পাটের স্থান। **পাট প্রধান বাণিজ্য শস্য**। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া

পশ্চিমবঙ্গে বিরাট চটশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারত পাট মারফত যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

পাট উৎপন্ন করিবার জন্য খুব উষ্ণ এবং আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন। প্লাবনে যে জমিতে প্রতি বৎসর পলি সঞ্চিত হয় সেখানে খুব ভাল পাট জন্মে।

পূর্ববঙ্গে পাটচাষের অনুকূল পরিবেশ আছে। কিন্তু দেশ-বিভাগের পরে ভারতীয় চটকলগুলির পাটের চাহিদার জন্য নূতন অনেক অঞ্চলে পাটের চাষ হইতেছে। বর্তমানে চব্বিশ পরগনা, হুগলী, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়াতে পাটের চাষ বেশী হয়। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরেও পাট চাষ বাড়িয়াছে।

অন্যান্য তন্তুজাতীয় ফসলের মধ্যে কার্পাস ও র‍্যামির নাম করা যাইতে পারে। সুন্দরবন অঞ্চলে যথেষ্ট কার্পাসের ফসল হইতেছে এবং জলপাইগুড়িতে একরকম উদ্ভিদ হইতে র‍্যামি উৎপন্ন হয়। র‍্যামির দ্বারা খুব শক্ত দড়ি তৈয়ারী হয়।

মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলাতে রেশম শিল্পের জন্য প্রচুর পরিমাণে তুঁত গাছের চাষ হয়। এইসব জেলায় রেশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় তামাক যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের সানুদেশের জেলাগুলিতে নানারকম মসলা পাওয়া যায়।

চা ঃ উত্তরে অবহিমালয় অঞ্চলে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় চা উৎপন্ন হয়। ডুয়ার্সে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চা উৎপন্ন হয়। যেসব স্থান ঢালু এবং যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অথচ জল জমে না সেইসব স্থানে চা জন্মে। চা উৎপাদনের জন্য সমভাবাপন্ন উত্তাপ দরকার।

চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে দার্জিলিং চা-এর চাহিদা খুব বেশী। চায়ের গাছ ৬ মিটার পর্যন্ত লম্বা হইতে পারে। কিন্তু সবসময়ই চা গাছের পাতা কাটিয়া ফেলিয়া ছোট ছোট ঝোপের আকারে রাখা হয়—কারণ পাতা যত বেশী কাটা যাইবে তত বেশী নূতন পাতার জন্ম হইবে। সেইজন্য কোন সময়ই চা গাছ ১ বা ১½ মিটারের বেশী বাড়িতে দেওয়া হয় না। দশ হাজার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতের ঢালু অংশে চা জন্মাইতে পারে। পর্বতগাত্রের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চা-বাগিচা তৈয়ারি করা হয়। এই রাজ্যে বর্তমানে তিন শতাধিক চা-বাগিচা আছে।



চা-বাগান

বাগিচা হইতে চা-পাতা তুলিয়া সেইগুলিকে পাকাইয়া গোল: করা হয় এবং কিছুদিন স্তূপাকারে রাখিয়া দেওয়া হয়—তাহার পর ঐ চা-পাতাকে শুকাইয়া গুণাবলী অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা

হয়। এক স্তরের চা'কে অন্য স্তরের সহিত মিশাইয়া চায়ের উৎকর্ষ বাড়ানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গে চা একটি প্রধান বাণিজ্যিক ফসল এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসার বড় উৎস। সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের চা-বাগানগুলির আয়তন ছয় শত একরের উপর হয়। চা-পাতা তুলিবার জন্য মহিলা শ্রমিক প্রচুর পরিমাণে নিয়োজিত আছে। চা-পাতা কাটিবার পর যখন নূতনভাবে দুইটি পাতা ও একটি কুঁড়ি গজায় তখন আবার তাহাকে একসঙ্গে কাটিয়া ফেলা হয়। তাই অনেক সময় চা'কে **'দুইটি পাতা, একটি কুঁড়ি'** বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়।

সবুজ চায়ের বাগিচা পাহাড়ের ঢালে মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করে। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষ চা-বাগিচায় নিযুক্ত আছে। এইসব বাগিচাকে কেন্দ্র করিয়া ছোট ছোট শহর বা গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। পাহাড়িয়া অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব দুরূহ বলিয়া শ্রমিকেরা চা-বাগিচার পাশে নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাষ কিছু করিয়া থাকে। শহরগুলির ভিতর **দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং ও মংপু** বিশিষ্ট চা শিল্পের কেন্দ্র।

ইক্ষু ঃ মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি ও বাঁকুড়াতে ইক্ষু চাষ হয়।

অন্যান্য ফসল ঃ ইহা ছাড়া এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে **তিল, তিসি, সরিষা** প্রভৃতি তৈলবীজ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে।

কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের চারিপাশে ৮০ কিলোমিটার জুড়িয়া প্রচুর পরিমাণে তরিতরকারি ও শাকসবজির চাষ হয় এবং প্রতিদিন কলিকাতার বাজারে চালান দেওয়া হয়। বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় **আলুর** চাষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর

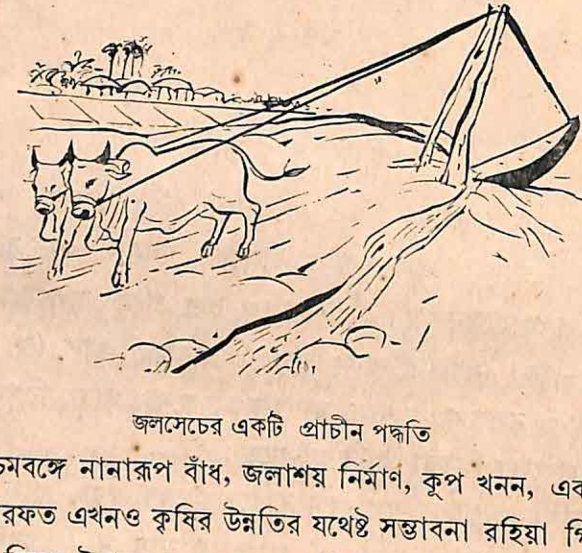
পরিমাণে **কমলালেবু** ও **সিনকোনা** জন্মে। **আম** প্রায় সর্বত্রই জন্মে কিন্তু মালদহের আম ভারতবিখ্যাত। রাঢ় অঞ্চলে বিশেষ করিয়া হুগলী ও বর্ধমানে **কলার** চাষ ব্যাপকভাবে হয়। বর্তমানে পরীক্ষা-মূলকভাবে দার্জিলিং জেলায় **আপেল** ও **নাশপাতির** চাষ আরম্ভ হইয়াছে এবং আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে।

জলসেচ ও কৃষি

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি প্রভূত পরিমাণে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে, কিন্তু প্রায়ই অনাবৃষ্টি বা প্রয়োজনের তুলনায় কম বৃষ্টি হইলে জলসেচের প্রয়োজন হয়। পশ্চিমবঙ্গে চার প্রকার জলসেচের ব্যবস্থা আছে :—(ক) সরকারী খাল, (খ) বে-সরকারী খাল, (গ) জলাশয়, (ঘ) কূপ ও নলকূপ। খাল মারফত জলসেচ দ্বারা বিগত কয়েক বৎসরে ফসলের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে।

জলাশয় ও কূপের জল বহন করিতে অনেক খরচ পড়ে এবং ঐ পদ্ধতিতে জল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়াও যায় না। সেইজন্য এই রাজ্যে কৃষির ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ স্থানে খালদ্বারা জলসেচ করা হয়। বে-সরকারী খালের জলে খাজনা দিতে হয় না বলিয়া ঐ খালের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, ২৪ পরগনা, হুগলী ও বর্ধমানে বে-সরকারী খাল খুব বেশী। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর ও হুগলীতে জলাশয় মারফত ব্যাপকভাবে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। কূপ খননের খরচ আরও কম। বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, মেদিনপুীর প্রভৃতি স্থানে কূপের

প্রচলন আছে। আজকাল গভীর নলকূপ দ্বারা কিছু কিছু অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫০ ভাগ কর্ষিত জমিতে খাল দ্বারা জলসেচ হইয়া থাকে। মোট ধান উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ ও ইক্ষু উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ জলসেচ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।



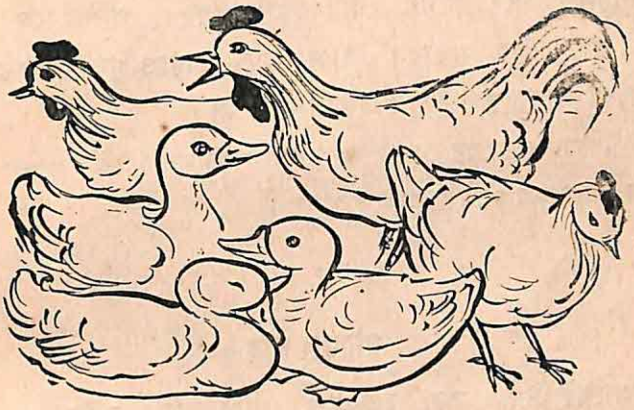
জলসেচের একটি প্রাচীন পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গে নানারূপ বাঁধ, জলাশয় নির্মাণ, কূপ খনন, এবং খাল নির্মাণ মারফত এখনও কৃষির উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে। আগামী দিনে ইহার জন্য অনেক পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হইয়াছে।

পশু-পাখি পালন

গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ও শূকর এই রাজ্যে গৃহপালিত পশুর মধ্যে প্রধান। এই রাজ্যে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা মোটামুটি সন্তোষজনক। গবাদি পশুদ্বারা চাষের কাজ ও তৈলবীজ নিষ্পেষণের

কাজ করানো হয়। ইহা ব্যতীত এইসব পশু হইতে প্রচুর পরিমাণে মাংস, দুধ ও চামড়া পাওয়া যায়। ভেড়া পালন করা হয় মাংস এবং পশমের জন্য। ছাগল হইতে দুধ ও মাংস পাওয়া যায়।



হাঁস-মুরগির চাষ

পশ্চিমবঙ্গে গৃহপালিত পশুর উপর ভিত্তি করিয়া অনেক কুটির-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার চারিপাশে অনেক **চর্মশিল্প** আছে এবং ৮টি **হাড়কল** আছে। সরকারী ও বে-সরকারী কয়েকটি **দুগ্ধজাত** দ্রব্যের কেন্দ্র সংগঠিত হইয়াছে।

উত্তরাঞ্চলে ঘোড়া ও খচ্চরের ব্যবহার দেখা যায়। পাহাড়ে যানবাহন হিসাবে ছোট ঘোড়া বা খচ্চর খুব উপকারী।

পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে হাঁস ও মুরগি প্রতিপালিত হয়। সরকারী কেন্দ্রে (পোলট্রি) মুরগি ও মুরগির ডিম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গত কয়েক বৎসরে বে-সরকারী স্তরেও অনেক পোলট্রি ও

পশুপালন কেন্দ্র গাড়িয়া উঠিয়াছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর হরিণঘাটা কেন্দ্র বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু গরুর দুধ উৎপন্ন হয় ১৭৬ লিটার এবং মহিষের দুধ হয় ৪৮৪ লিটার। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে গবাদি পশুর খাদ্যের খুব অভাব। যাহা আছে তাহাও খুব পুষ্টিকর নহে, ফলে দুধ আশানুরূপ উৎপন্ন হইতে পারে না।

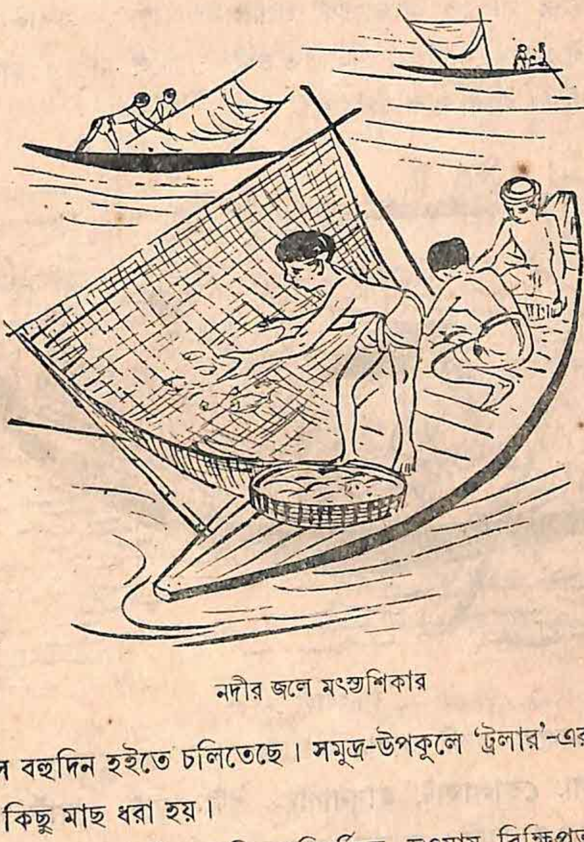
পশ্চিমবঙ্গ জলের দেশ বলিয়া হাঁস পালনের দিকে আরও নজর দিলে ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে।

মাছের চাষ

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের নদীনালায় প্রচুর পরিমাণে মাছের চাষ হয় এবং বেশকিছু সংখ্যক মানুষ এই উপজীবিকায় লিপ্ত আছে। পশ্চিমবঙ্গে দুই রকমের জলে মাছ ধরা হয়—লোনা জলের মাছকে **'লোনা'** বলা হয়। যেমন, পারশে, ভেটকি, চিংড়ি, তপ্‌সে প্রভৃতি। পেয় জলের মাছকে **'পোনা'** বলা হয়। যেমন, রুই, কাত্‌লা, মৃগেল প্রভৃতি। মাছ বাঙালীদের রোজকার খাদ্য। কিন্তু বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট সরবরাহ নাই বলিয়া অন্যান্য রাজ্য হইতে এই রাজ্যে চালানী মাছ অনেক আনিতে হয়।

চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহে পুকুরে এবং বড় বড় জলাশয়ে মাছের চাষ হয়। সামুদ্রিক মাছ—ইলিশও বর্ষার সময়

নদীতে চলিয়া আসে এবং প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়। ভাগীরথী ও রূপনারায়ণে প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা হয়। গভীর জলের মাছ ধরিবার

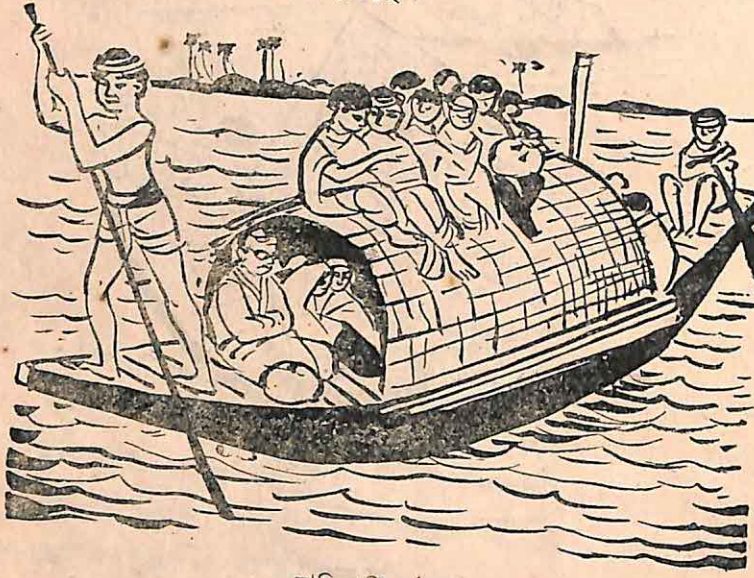


নদীর জলে মৎস্যশিকার

প্রয়াস বহুদিন হইতে চলিতেছে। সমুদ্র-উপকূলে 'ট্রলার'-এর সাহায্যে কিছু কিছু মাছ ধরা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রচুর জলাশয় আছে কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই নানা জলজ উদ্ভিদ জন্মানোর ফলে এবং নিয়মিত সংস্কার না হওয়াতে মাছের চাষ অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত খাল-বিলের সংস্কারসাধন করিয়া মাছের চাষ অনেক বাড়ানো যায়।

দামোদর ও রূপনারায়ণ নদী আগের চাইতে অনেক ভরাট হইয়া যাওয়াতে মাছের চাষ কমিয়া গিয়াছে। মাছ আমদানির জন্য এইসব নদীরও সংস্কারের প্রয়োজন আছে। ফরাক্কা বাঁধের জন্য ভাগীরথীতে বেশী জল প্রবাহিত হইবে ; ফলে মাছের চাষ ভাল হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।



যাত্রিবাহী নৌকা

পশ্চিমবঙ্গে ছয়টি প্রধান মাছের কারবারের কেন্দ্র আছে— লালগোলা, কোলাঘাট, হাসনাবাদ, ইটিণ্ডাঘাট, পোর্ট ক্যানিং ও ডায়মণ্ড হারবার। সমুদ্রোপকূলে মাছ ধরিবার উপযুক্ত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করিলে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যাইবে।

মাছ ধরাকে কেন্দ্র করিয়া কিছু শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে—যেমন, নৌকা নির্মাণ, বিভিন্ন ধরনের জাল ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ঠাণ্ডা ঘর ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের বিস্তৃতি কোথায় কোথায় আছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং চিত্র আঁকিয়া তাহাতে দেখাও।

২। সুন্দরবন হইতে কি কি সামগ্রী আহরণ করা হয় ?

৩। বনজ সম্পদ হইতে আমরা সমাজে কি কি উপকার পাইতে পারি ?

৪। একটি মানচিত্র আঁকিয়া কোথায় ধান ও কোথায় চা উৎপাদন হয় রেখার সাহায্যে দেখাও।

৫। পাট উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ কি হওয়া দরকার ?

৬। পশ্চিমবঙ্গের নিম্নলিখিত জেলা ও তাহার পাশে কিছু উৎপন্ন দ্রব্যের নাম করা হইল। যে উৎপন্ন দ্রব্য ঐ জেলায় হয় তাহাতে (×) চিহ্ন দাও—

দার্জিলিং—পাট, ধান, রেশম, চা।

মুর্শিদাবাদ—চা, শালকাঠ, রেশম, ধান।

চব্বিশ পরগনা—ধান, পাট, চা, সেগুনকাঠ, রেশম।

পুরুলিয়া—মাছ, ধান, পাট, শালকাঠ, রেশম।

৭। পশ্চিমবঙ্গে মাছ ধরিবার উৎস কোথায় ?

৮। পশ্চিমবঙ্গে পশু ও পাখি হইতে কি কি খাদ্য সংগ্রহ করা হয় ?

৯। একটি মানচিত্রে প্রধান নদীগুলি আঁকিয়া ইলিশ মাছ কোথায় কোথায় পাওয়া যায় দেখাও।

১০। মাছধরাকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গে কি কি শিল্প গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা আছে ?

১১। মাছের কারবারের প্রধান কেন্দ্রগুলির নাম কর।

চতুর্থ অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদ ও শিল্পসম্ভার

খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। রাজ্যের খনিজ পদার্থের ভিতর কয়লা সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়। অন্যান্য খনিজ সম্পদের ভিতর চুনাপাথর, **ডলোমাইট, টাঙ্গস্টেন,** অভ্র, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ উল্লেখযোগ্য। নিকৃষ্ট-স্তরের লৌহ আকরিক কিছু পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় না। ইহা বিশেষ-ভাবে সীমাবদ্ধ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে এবং উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে। রাজ্যের বদ্বীপ অঞ্চলে স্বাভাবিক গ্যাস ও খনিজ তৈলের জন্য সন্ধানকার্য চলিতেছে—এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কয়লা ঃ এই রাজ্যে কয়লা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। ভারতের মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং এখানকার কয়লা উৎকৃষ্টতার জন্য শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সমগ্র রাজ্যে প্রায় ৩০০ কয়লার খনি আছে—তাহার ভিতর বেশীর ভাগ বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। অনুমান করা হয়, খনির বিভিন্ন স্তরে প্রায় ৮০০ কোটি টন কয়লা জমা আছে। প্রতি বৎসরে ২ কোটি টন কয়লা উত্তোলিত হইতেছে।

বর্ধমান জেলার **রাণীগঞ্জ** ও **বরাকর** এলাকায় সব-চাইতে বেশী কয়লার খনি দেখা যায়। প্রধান কয়লাখনির মধ্যে রামনগর, সালানপুর, দিশেরগড়, আসানসোল, চুরুলিয়া, গৌরাঙ্গডিহি, চরণপুর, কালীপাহাড়ী, শিবপুর, রাণীগঞ্জ, তপসি, কেন্দুয়া, পুরুষোত্তমপুর, উখরা ও কাজোরিয়া উল্লেখযোগ্য। ১৭৭৪ সালে এই অঞ্চলে ভারতে সর্বপ্রথম কয়লার খননকার্য শুরু হয় এবং ব্যাপকভাবে শুরু হয় ১৮৮৫ সালে কলিকাতার সহিত এই অঞ্চলের রেল-সংযোগের পর হইতে। ২৩৪ বর্গ-কিলোমিটার ব্যাপী এই কয়লাখনি অঞ্চল রহিয়াছে এবং বহুদিন যাবৎ কয়লা উত্তোলনের ফলে খনিগুলির গভীরতা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। রাজ্যের শিল্পোন্নতির মূলে এই কয়লাখনিগুলির অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চল ব্যতীত **দার্জিলিংএ** কিছু কয়লা পাওয়া যায়—তবে ঐ কয়লা শিল্পের ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যবহৃত হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনিগুলির সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে, খনিগুলি হইতে কয়লা উত্তোলন করা বেশ ব্যয়সাধ্য। খনিগুলির গভীরতা প্রায় ৬১৪ মিটার নীচে চলিয়া গিয়াছে এবং উত্তোলনের যন্ত্রপাতিও খুব বিজ্ঞানসম্মত নহে। পুরাতন পদ্ধতিতে কয়লা তোলা হয় বলিয়া প্রচুর কয়লা নষ্ট হইয়া যায়। কয়লাখনি অঞ্চলে বিহার হইতে প্রায় সমস্ত শ্রমিক কাজ করিতে আসে।

খুব বিপদের ঝুঁকি লইয়া শ্রমিকদের খনিতে কাজ করিতে হয় এবং প্রায়ই খনি-দুর্ঘটনা ঘটে। কোন কোন সময় গ্যাসের সংস্পর্শে আসিয়া জীবনহানি হয়, আবার কখনও ছাদ ধ্বসিয়া শ্রমিকেরা জীবন্ত কবরে বিলীন হইয়া যায়। দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফাঁকা গহ্বরগুলি বালির দ্বারা ভরাট করা হয়। সম্প্রতিকালে

সরকারের তত্ত্বাবধানে দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অনেক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে।

চীনামাটি : ইহা চীনামাটির শিল্প গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় ইহা পাওয়া যায়।

চুনাপাথর : বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার কিছু অংশে ইহা পাওয়া যায়।

তাম্র : বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ও দার্জিলিংএ পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ি জেলার বক্সায় কিছু পরিমাণে তাম্র আছে।

অভ্র : বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়।

ম্যাঙ্গানিজ : ইস্পাত শিল্পে ইহা খুব প্রয়োজনীয় ধাতু। মেদিনীপুরের কয়েকটি অঞ্চলে, পুরুলিয়া এবং বর্ধমানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের ম্যাঙ্গানিজ কিছু পরিমাণে বিদেশেও রপ্তানী হয়।

ডলোমাইট : ইহা চুনাপাথরের সমকক্ষ ধাতু। জলপাইগুড়ি জেলায় বক্সা দুয়ারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

টাঙ্গস্টেন : ইহার সাহায্যে ভালো ইস্পাত তৈরী হয়। বাঁকুড়া জেলায় ইহা কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়।

লৌহ : আগেই বলা হইয়াছে—উচ্চগুণসম্পন্ন লৌহ পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় না। পুরুলিয়া ও বর্ধমান অঞ্চলে কিছু পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের ইস্পাত শিল্প ওড়িশার লৌহ আকরিকের সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে।

রাণীগঞ্জ এলাকায় কয়লা উত্তোলনের ও সদ্‌ব্যবহারের বিপুল

সম্ভাবনা রহিয়াছে। ঝরিয়া ও দামোদর উপত্যকার কয়লা ক্রমেই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে; তাই কোনরূপ অপচয় যাহাতে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে কয়লা উৎপাদন ও তৎসহ শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে; তাই কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থাপনা আরও মজবুত হওয়া দরকার। নিকৃষ্ট কয়লা শোধিত করিবার জন্য কয়লাখনি অঞ্চলে কয়লা শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। তাপকেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণে কয়লার ভূমিকাকে আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সম্প্রতি কয়লাখনি জাতীয়করণ হইয়াছে; আশা করা যাইতেছে, কয়লার প্রগতিমূলক ভূমিকা দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইবে।

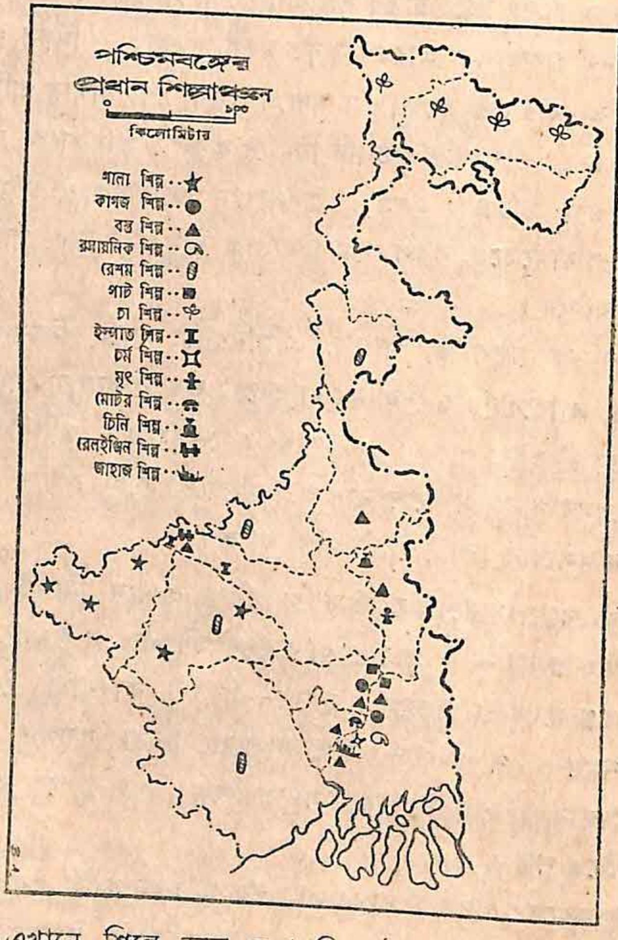
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পাইপ, এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নিযুক্ত কিছু যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরি ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য বাসনপত্র চীনামাটি দ্বারা তৈয়ারী হইয়া থাকে। চুনাপাথর হইতে সিমেণ্ট তৈয়ারী হয়। আরও যেসব খনিজ সম্পদের নাম করা হইয়াছে তাহা হইতে কোন-না কোন মূল্যবান দ্রব্য তৈয়ারী হইয়া থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে সিমেণ্টের যথেষ্ট চাহিদা কিন্তু এখানে সিমেণ্ট একেবারেই উৎপন্ন হয় না। দুর্গাপুর বা বার্ণপুর অঞ্চলের লৌহ কারখানার লৌহ ভগ্নাবশেষ (ধাতুমল) হইতে—সিমেণ্ট কারখানা তৈয়ারী হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে খনিজ সম্পদের ভিতর কয়লার পরেই লবণের স্থান। লবণ উৎপাদনে সমুদ্রের জল বিপুল ভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের ধাতব সম্পদের সামগ্রিক মূল্যায়ন হওয়া দরকার ও পশ্চিমবঙ্গে খনিজ সম্পদকে আরও ভালভাবে কি উপায়ে কাজে লাগানো যায় তাহা লইয়া অনেক গবেষনা হওয়া উচিত।

শিল্পসম্ভার

পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদ, যানবাহন ব্যবস্থা, কৃষিজাত দ্রব্য জনসংখ্যা ও বন্দরের সুবিধা থাকাতে অনেকদিন আগেই অন্যান্য রাজ্য



অপেক্ষা এখানে শিল্পে দ্রুত অগ্রগতি হইয়াছে। চট ও কার্পাস শিল্পের ইতিহাস অনেক পুরাতন। সম্প্রতিকালে অন্যান্য শিল্প

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেসব শিল্প রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :—

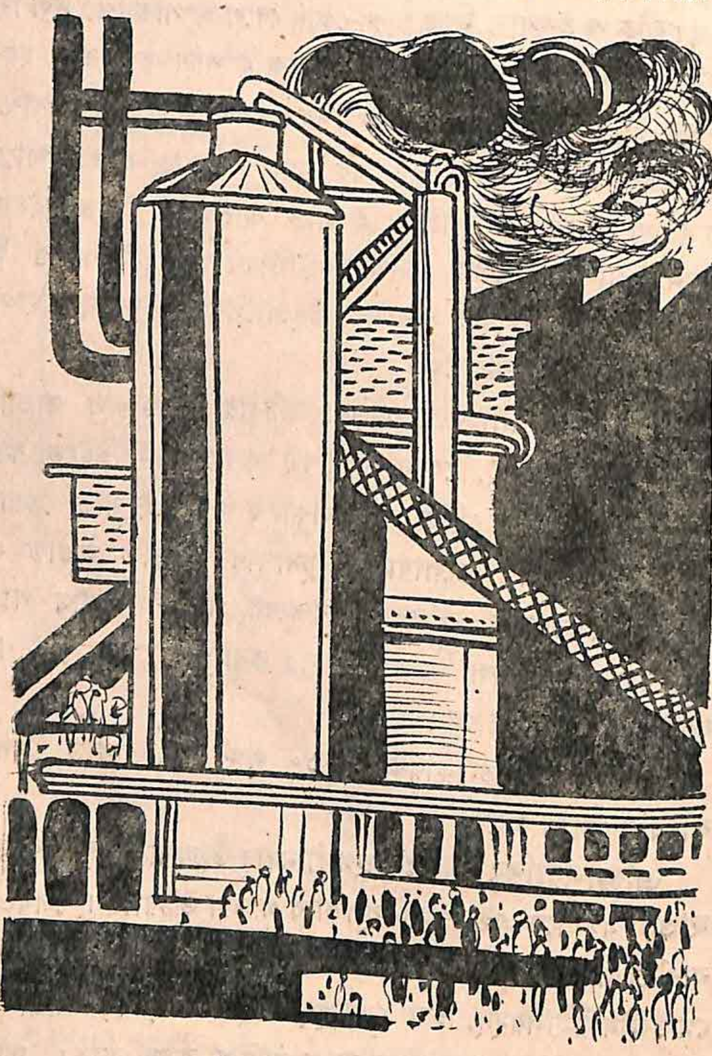
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প : যে-কোন দেশে ইস্পাত শিল্প **মূল শিল্প** হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমান যুগকে ইস্পাত যুগ বলা হয়—কারণ এই শিল্প অন্যান্য শিল্পের স্তম্ভস্বরূপ কাজ করিতেছে। পশ্চিম-বঙ্গ এই শিল্পে সমস্ত ভারতে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এ রাজ্যে অনেকগুলি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা নির্মিত হইয়াছে, যেমন—**আসানসোলের** নিকটে ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি। দুর্গাপুরে সরকারী উদ্‌যোগে বিরাট আকারে ইস্পাত কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই অঞ্চলে লৌহশিল্প গড়িয়া উঠিবার কতকগুলি স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা আছে, যেমন—রাণীগঞ্জ কয়লা খনি হইতে কয়লা পাওয়া যায়, ওড়িশা হইতে লৌহ আকরিক আসে, ইস্পাত তৈয়ারির ব্যাপারে ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট, চুনাপাথর প্রভৃতি অন্যান্য ধাতু সহজেই পাওয়া যায়, কলিকাতা বন্দরের পরিপূর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়, দামোদরের জল যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায় এবং চারিপাশে যথেষ্ট দক্ষ শ্রমিক আছে।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে।

এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প : হুগলী নদীর উভয়পার্শ্বে **কলিকাতা ও হাওড়া** নগরীতে এই শিল্প বিপুলভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্রেথওয়েট, বার্ণ, জেসপ, টেক্সম্যাকো, জয় এঞ্জিনিয়ারিং, গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরী, গেস্টকীন উইলিয়ম্‌স্, হিন্দ মোটর্‌স্ প্রভৃতি বড় বড় এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা আছে যেখানে সহস্র সহস্র শ্রমিক কাজ করে। তাছাড়া

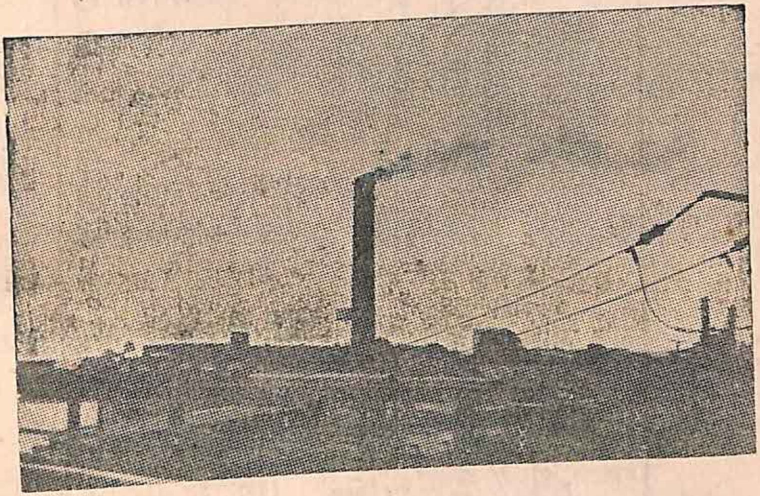
সেতু নির্মাণ, বড় বড় গৃহ নির্মাণ, অন্য শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি করা হয়। গার্ডেনরীচ ওআর্কশপে জাহাজ নির্মাণ করা



দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার একাংশ

হয়। **চিত্তরঞ্জনে** রেল এঞ্জিন তৈয়ারি করা হয়। বড় বড় কারখানা ছাড়াও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা চারিদিকে ছড়াইয়া আছে।

চট শিল্প : পশ্চিমবঙ্গে চট শিল্পের স্থান প্রথম। প্রায় ১০০ চট-কলে ২,৫০,০০০ শ্রমিক কাজ করে। বজবজ হইতে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত ভাগীরথীর দুই তীরে এই চটকলগুলি অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজাত



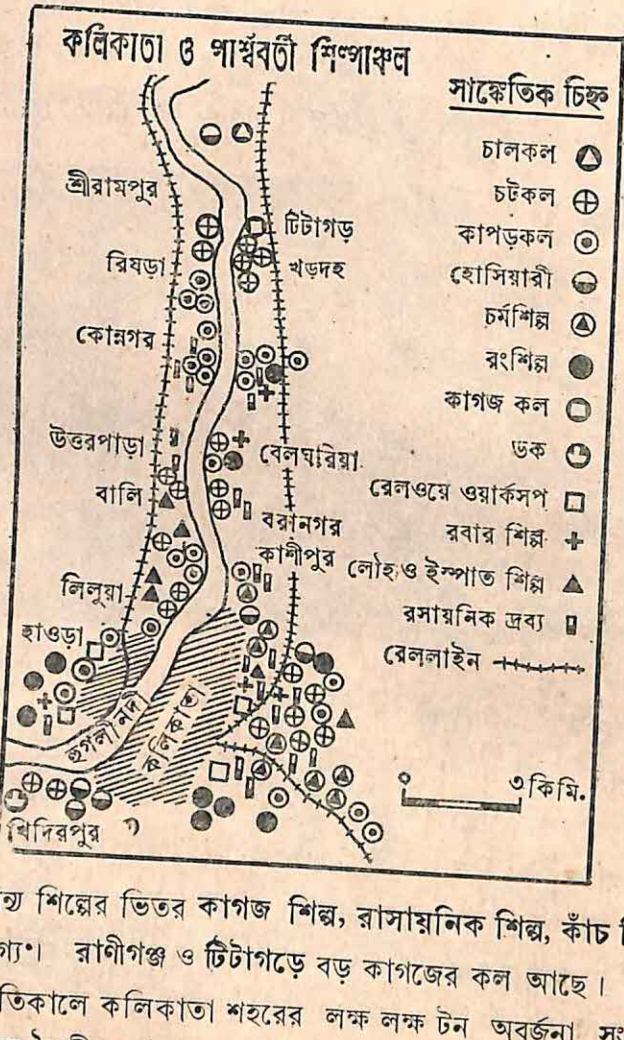
কলিকাতার কাছে একটি চটকল

দ্রব্যের মধ্যে পাট প্রচুর পরিমাণে জন্মে; কয়লা, জল ও শ্রমিকের সুবিধা যথেষ্ট আছে। চটের বিদেশী বাজার খুব ভাল। তাই খুব সংগঠিত শিল্প হিসাবে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

কার্পাস শিল্প : কলিকাতা ও আশেপাশে ৪১টি কাপড়ের কল গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার পর এই রাজ্যে কাপড়ের কলের কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে।

চা শিল্প : চট শিল্পের পরেই এই শিল্পের স্থান। বর্তমানে প্রায়

৩০০টি কারখানা আছে। বেশীর ভাগ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংএ অবস্থিত।



অন্যান্য শিল্পের ভিতর কাগজ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, কাঁচ শিল্প উল্লেখযোগ্য। রাণীগঞ্জ ও টিটাগড়ে বড় কাগজের কল আছে।

সম্প্রতিকালে কলিকাতা শহরের লক্ষ লক্ষ টন অবর্জনা সংগ্রহ করিয়া সার তৈরীর কারখানা গড়িবার পরিকল্পনা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার জন্য যেসব উপাদান আছে তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক শিল্প গড়িয়া উঠিতে গেলে আরও কি দরকার এবং এই রাজ্যের দুর্বলতা কোথায় তাহা জানা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে কয়লা যথেষ্ট তাপশক্তির কাজ করে—কিন্তু যাহা উত্তোলন হয় প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নগণ্য। কয়লার পরেই **বিদ্যুতের** প্রশ্ন উঠে। বিজ্ঞানীদের মতে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৩-৭৪ সালে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়া উচিত ১৪৯০·৯ মেগাওআট (বিদ্যুতের মাপ), কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণ অর্ধেক। ব্যাণ্ডেল তাপকেন্দ্র, দুর্গাপুর কোকওভেন তাপকেন্দ্র, জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রভৃতি স্থানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। ইহা ছাড়া কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কিছু বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু ইহা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম বলিয়া শিল্প যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে। যদিও বিগত ১০ বৎসরে উৎপাদন অনেক বাড়িয়াছে কিন্তু উৎপাদনের গতি আরও বাড়াইতে না পারিলে শিল্পের অগ্রগতি ক্ষীণ হইবে।

কলিকাতা শিল্পাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র। এইখানে বন্দরে মালপত্র রপ্তানী এবং আমদানী হয়। সমস্ত রাজ্যের সহিত দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকিলে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিও বাড়িবে না। হুগলী নদীর নাব্যতা ক্রমেই স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। বড় জাহাজ বেশী মালপত্র লইয়া কলিকাতা বন্দরে আসিতে পারে না। স্বভাবতঃই তাহাতে শিল্পের অগ্রগতির ক্ষতি হইতেছে। ফরাক্কা বাঁধ চালু হইলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইবে। নিয়মিতভাবে ভাগীরথীর পলি-নিষ্কাশন অবশ্যকরণীয় হইয়া পড়িয়াছে।

কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে মালবাহী ও যাত্রিবাহী গাড়ির ভিড় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে—কিন্তু সে তুলনায় প্রশস্ত এমন রাস্তা নাই যাহার মারফত যানবাহন অবাধে যাতায়াত করিতে পারে।

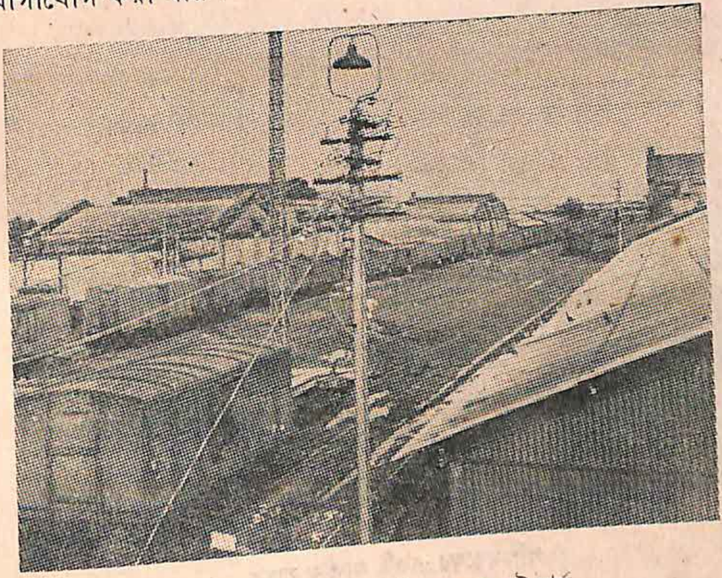


কলিকাতা বন্দরে মাল খালাসের দৃশ্য

হাওড়ার সহিত কলিকাতার যোগাযোগ প্রকৃতপক্ষে একটি সেতু মারফত—ফলে যানবাহন চলাচল প্রায় বিকল হইয়া পড়িয়াছে।

বর্তমানে আরও একটি সেতুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং জাতীয় সড়কগুলির সহিত নানারূপ যোগাযোগের জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে। তাহার পরিকল্পনাও সি. এম. ডি. এ. সংস্থা বিস্তারিত-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

কলিকাতার সংলগ্ন দু'টি রেল স্টেশন—শিয়ালদহ ও হাওড়া—হইতে অন্যান্য খনি অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের সহিত স্থলপথে সহজেই যোগাযোগ করা যায়।



কলিকাতার সংলগ্ন একটি রেলওয়ে ইআর্ড

শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের সহিত কলিকাতার যোগাযোগ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড মারফত আছে কিন্তু বর্তমানে এই রাস্তা খুবই অপ্রশস্ত। সুতরাং দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সোজা ও প্রশস্ত রাস্তা অবিলম্বে নির্মাণ করা উচিত।

যানবাহনের সমস্যা ছাড়াও কয়লা, চা, পাট ইত্যাদি সরবরাহের জন্য প্রচুর পরিমাণে রেল ওআগনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বর্তমানে ওআগনের অভাবে অনেক কাজ পিছাইয়া পড়ে। পাহাড় অঞ্চল হইতে চা আনিবার ব্যাপারে অনেক অসুবিধা দেখা যায়। বর্ষাকালে পাহাড়িয়া রাস্তা অনেক ক্ষেত্রে ধ্বসিয়া পড়ে এবং ফলে সব যান-চলাচল বন্ধ থাকে। এই অঞ্চলের যানবাহনের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।



পশ্চিমবঙ্গের একটি জাতীয় সড়ক

নদীগুলির খননকার্য হইলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বাড়িবে। বাণিজ্য বাড়িলেই শিল্প দ্রুত অগ্রগতির পথে যাইবে।

অনুশীলনী

১। পশ্চিমবঙ্গে কি কি খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় তাহা সংক্ষিপ্তভাবে লিখ।

২। একটি মানচিত্রে কয়লা খনিগুলির অবস্থান দেখাও এবং ঐ খনিগুলির পাশে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বসাও :—

আসানসোল, রাণীগঞ্জ, কুলটি, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর।

৩। দুর্গাপুরে লৌহ শিল্প গড়িয়া উঠিবার কারণ কি?

৪। কলিকাতা শহরের চারিপাশে এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়িয়া উঠিল কেন?

৫। চট ও চা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনে কি ভূমিকা পালন করে?

৬। দুর্গাপুরে লৌহ শিল্প আর দার্জিলিংএ চা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে—এর ব্যতিক্রম কেন হইল না?

৭। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে কি কি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে বল :—

চিত্তরঞ্জনে—

গার্ডেনরীচে—

টিটাগড়ে—

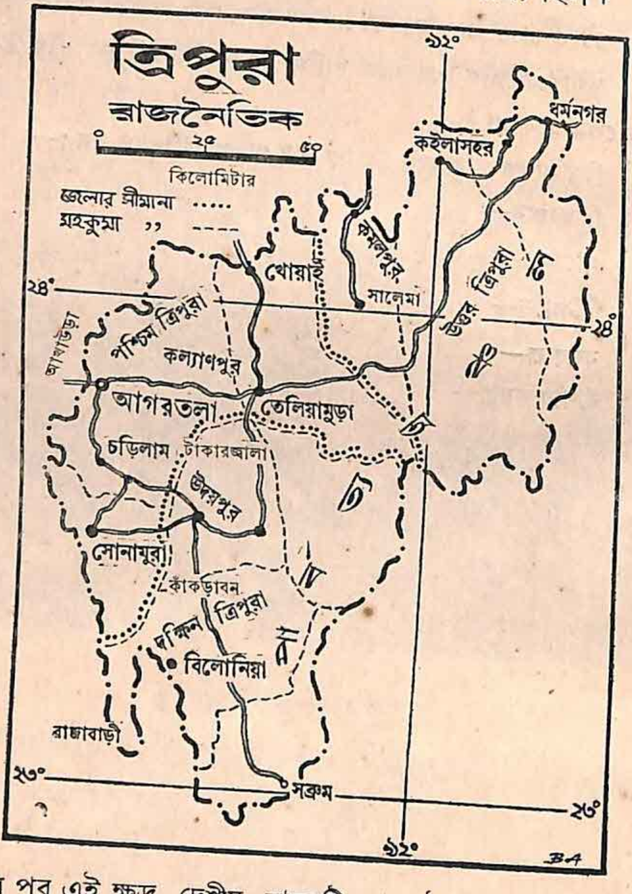
বজবজে—

বাঁশবেড়িয়ায়—

পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিপুরা রাজ্য

দেশ-পরিচিতি ঃ ত্রিপুরা ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ব্রিটিশ আমলে ইহা একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। ভারত



বিভাগের পর এই ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যটি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সহিত যোগদান করে। ইহা এতদিন কেন্দ্রের দ্বারা শাসিত রাজ্য

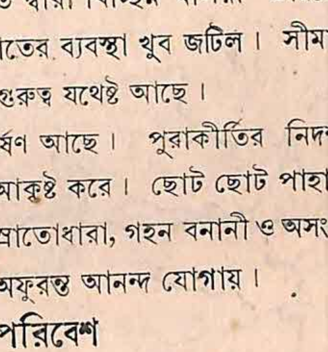
ছিল, কিন্তু ১৯৭২ সালের ২১শে জানুআরি এই রাজ্যকে **পূর্ণাঙ্গ রাজ্য রূপে** ঘোষণা করা হয়।

এই রাজ্যের আয়তন ১০৪৬১ বর্গ কিলোমিটার (৪০৩৬ বর্গ মাইল)। উত্তর-পূর্বে আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলা ও নবগঠিত মিজো রাজ্য ব্যতীত অন্য সকল দিকেই ইহা সদ্যোজাত বাংলাদেশের সীমানা দ্বারা পরিবৃত। পাহাড়পর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন বলিয়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে এখানে যাতায়াতের ব্যবস্থা খুব জটিল। সীমান্ত এলাকা বলিয়া এখানকার সামরিক গুরুত্ব যথেষ্ট আছে।

এই রাজ্যের নিজস্ব একটা আকর্ষণ আছে। পুরাকীর্তির নিদর্শন ও প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। ছোট ছোট পাহাড়, ঢেউখেলানো সবুজ প্রান্তর, উচ্ছল স্রোতোধারা, গহন বনানী ও অসংখ্য হ্রদ মানুষকে মুগ্ধ করিয়া রাখে এবং অফুরন্ত আনন্দ যোগায়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

ভূ-প্রকৃতির গঠন অনুসারে ত্রিপুরাকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(ক) পার্বত্য ঞ্চল ও (খ) সমভূমি অঞ্চল।



পাহাড়ী পথ

(ক) **পার্বত্য অঞ্চল** : ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থানই পর্বতসংকুল। ছয়টি বড় বড় পর্বতমালা প্রায় সমান্তরালভাবে উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। পূর্ব সীমানার কাছাকাছি পর্বতগুলির উচ্চতা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই পর্বতগুলির নাম—বড়মুড়া, আঠারোমুড়া, লংতরাই,

কোন স্থানেই অসহ্য গরম পড়ে না। শীতকালে আবহাওয়া বেশ মনোরম। এই রাজ্যে বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক গড় ২১২৫ মিলিমিটার (৮৫ ইঞ্চি) এবং বায়ুর আর্দ্রতা বেশী। বৎসরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার গড় ৯৫° ফারেনহাইট (৩৫° সেন্টিগ্রেড) এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫১° ফারেনহাইট (১০° সেন্টিগ্রেড)। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তারতম্য খুব বেশী নয় বলিয়া ইহাকে **সমভাবাপন্ন জলবায়ু** বলা যাইতে পারে।

মৃত্তিকার প্রকারভেদ: এই রাজ্যের মৃত্তিকাকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। **পার্বত্য মাটি, কাঁকরযুক্ত লাল মাটি** (ল্যাটারাইট) ও **পলিমাটি**। নদীবাহিত **পলিমাটি** বেশ উর্বর।

ত্রিপুরার অধিবাসী

দেশ বিভাগের আগে ত্রিপুরাতে আদিবাসীদের সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু আধুনা পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) হইতে ক্রমাগত শরণার্থী আসিয়া এই রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করাতে তাহাদের সংখ্যা এখন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। মোট ১৭ লক্ষ অধিবাসীর ভিতর তিন লক্ষের কিছু বেশী আদিবাসী। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান—সব ধর্মের মানুষ এখানে বসবাস করে।

ত্রিপুরাতে প্রায় ১৮টি উপজাতি আছে। উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরী, রিয়াং, মগ, চাকমা, কুকী, মণিপুরী, জামাতিয়া, লাওয়াতিয়া, গারো, লুসাই প্রভৃতি প্রধান। বহুকাল হইতে যাহারা ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করিত তাহারা ত্রিপুরার আদিবাসী। অন্যান্য পার্শ্ববর্তী স্থান হইতেও কিছু আদিবাসী এইখানে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে বাস করিয়া আসিতেছে।

ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগ **ত্রিপুরী**। ত্রিপুরার

সর্বত্র ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরী মেয়ে পুরুষ সকলেই কঠোর পরিশ্রমী। কৃষি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। তাঁতের কাজেও ইহারা খুব দক্ষ। ইহারা ত্রিপুরী ভাষায় কথা বলিলেও বাংলা বুঝিতে পারে। অন্যতম প্রধান আদিবাসী রিয়াং। ইহারাও খুব পরিশ্রমী ও সাহসী এবং শিকার করিতে খুব ভালবাসে। ইহারা সাধারণতঃ ঝুম প্রথায় চাষ করে। ইহাদের মেয়েরা যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম করিতে পারে।

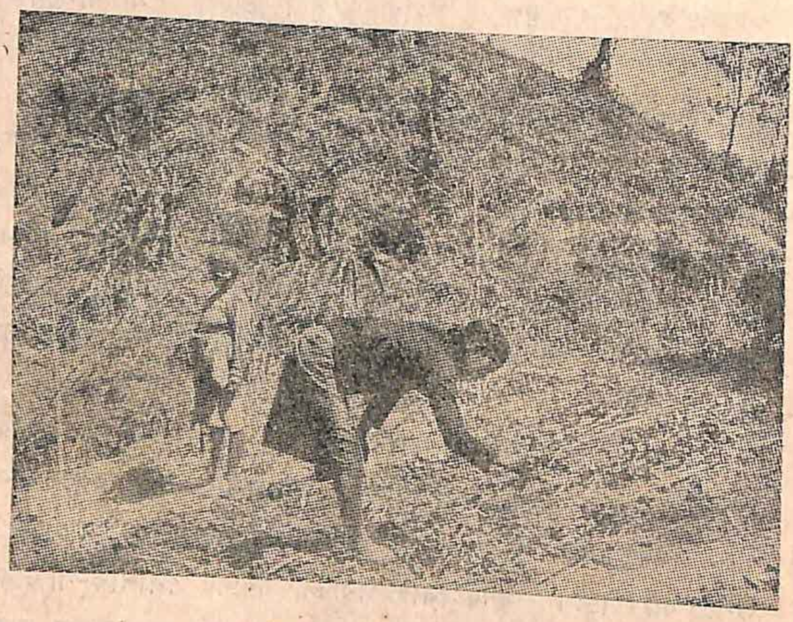
বাহির হইতে যাহারা গিয়াছে তাহাদের মধ্যেও বেশীর ভাগ মানুষ চাষবাসের কাজে নিয়োজিত হইয়াছে। অফিস, আদালত, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে অনেকে চাকরি করে। ব্যবসাক্ষেত্রে বহিরাগতদের প্রাধান্য বেশী।

এখানকার অধিবাসীরা সাধারণতঃ বাঁশ ও ছনের ঘর তৈয়ারি করে। পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীরা স্যাতসেঁতে জমি হইতে যে গ্যাস নির্গত হয় তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 'মাচানের' উপর ঘর বাঁধে। আদিবাসীরা বিভিন্ন ধরণের পোশাক-পরিচ্ছদ পরে। তবে সম্প্রতিকালে বেশীর ভাগ মানুষ বাঙালীদের মত পোশাক পরিধান করে। শহরগুলিতে অনেকে পাকা বাড়িতে থাকে এবং পোশাক হিসাবে প্যাণ্ট ও শার্ট ব্যবহার করে।

ত্রিপুরার উৎপন্ন দ্রব্য

কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে **ধান** সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য। খাদ্যশস্য ও পণ্যশস্যের ভিতর কার্পাস, পাট, চা, ইক্ষু, আলু, সরিষা, পেঁয়াজ, আদা, সুপারি, তৈলবীজ, চীনাবাদাম, ডাল, তিল, লঙ্কা, তামাক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাট ও চা বিদেশে রপ্তানি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। এই রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের ফলের

চাষ হয়। উহাদের মধ্যে আনারস, কমলালেবু, নারিকেল, কাজুবাদাম ও লিচু উল্লেখযোগ্য।



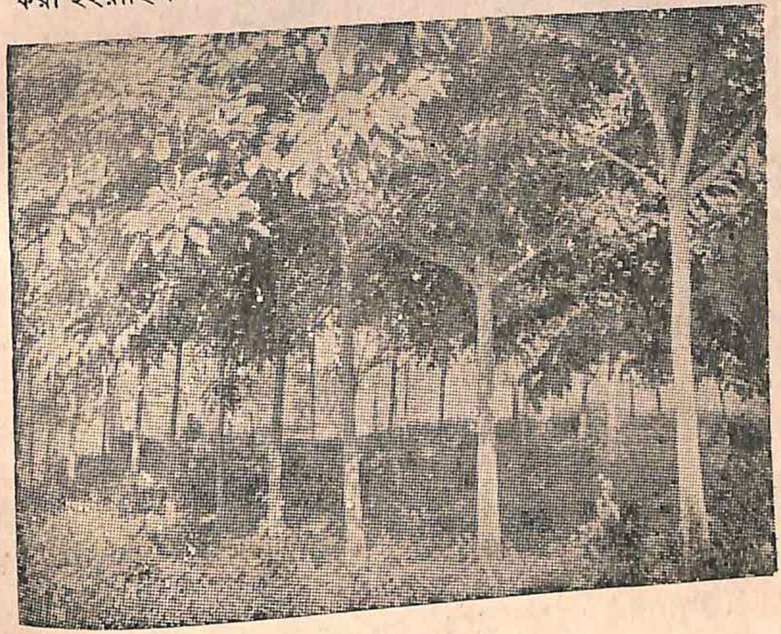
ঝুম চাষের আগে জমি তৈরি করা হইতেছে

ত্রিপুরার উপজীবিকার ভিতর কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশবিভাগের পূর্বে এই রাজ্য খাদ্যে স্বয়ম্ভর ছিল কিন্তু বর্তমানে জনবসতি অনেক গুণে বাড়িয়া যাওয়াতে খাদ্যের খুব অভাব দেখা দিয়াছে। তাই নানাভাবে খাদ্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। পুরাতন ঝুম প্রথার পরিবর্তে আধুনিক প্রথা প্রচলন অনেক স্থানে হইয়াছে। আমন, আউশ ও বোরো ধান ছাড়াও **তাই চুং, মনোহর,** জয়া, পদ্মা, আই. আর, প্রভৃতি বহুধরনের নূতন নূতন ধান উৎপন্ন হইতেছে। ধান উৎপাদনে সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দেওয়া

হইয়াছে। ত্রিপুরার চাষীরা কিছু কিছু জমিতে গম ফলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। খুব অল্প হইলেও কোন কোন স্থানে চাষের কাজে যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হইতেছে। পণ্যশস্যের ভিতর পাট ও আলুর চাষ পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত হইয়াছে।

মাছের চাষের জন্য নূতন নূতন জলাশয়ের সংস্কার করিয়া মাছের চাষ অনেক বাড়ানো হইয়াছে।

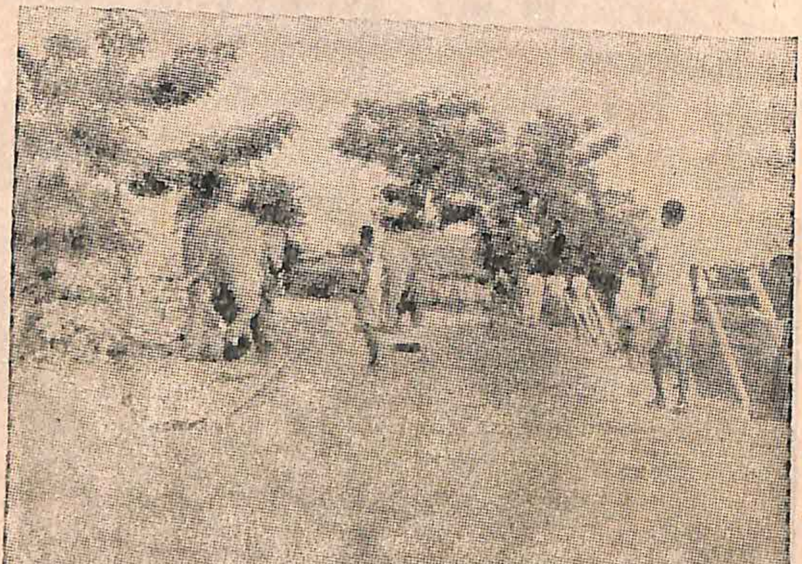
এই রাজ্য অতিবৃষ্টি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সর্বত্র সমভাবে বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ জলসেচের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভূত হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিছু ছোট প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছিল। শালগড় প্রভৃতি স্থানে সেচের ব্যবস্থা আছে।



ত্রিপুরায় রবার চাষ

বনভূমি : ত্রিপুরার এক বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া **বনভূমি** আছে।

কিন্তু দুর্গম প্রকৃতি, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, জঙ্গল কাটিয়া নূতন বসতি স্থাপন, ঝুম প্রথায় চাষ ইত্যাদির ফলে বনভূমির বেশ কিছু অংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা আছে তাহাকেও খুব বেশী কাজে লাগানো যায় না। দক্ষিণের বনভূমিতে শাল, তুন, জারুল, গর্জন, বেত ও প্রচুর বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার বনভূমির কাঠ দিয়া নৌকা তৈয়ারি করা হয়। সংরক্ষিত বনে সেগুন, মেহগনী,



ত্রিপুরায় হাতীর সাহায্যে কাঠ সংগ্রহের দৃশ্য

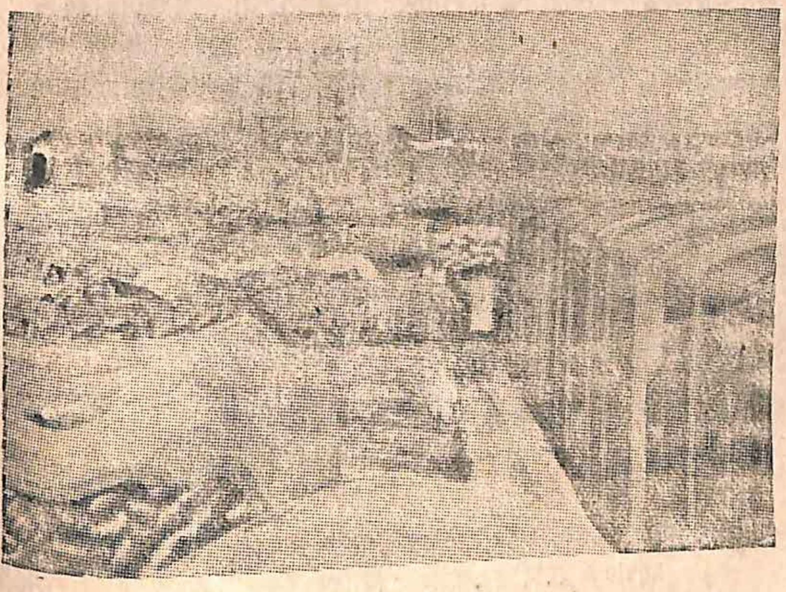
শিশু, রবার ও তুঁতগাছের চাষ করা হয়। কাঠ-সংগ্রহে হাতীর সাহায্য লওয়া হয়।

পশুপালন : পশুপালনের জন্য অনেকগুলি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া পালিত পশুর মধ্যে প্রধান।

গবাদ পশু কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। খাদ্য হিসাবে ছাগল ও ভেড়া পালিত হয়। দুধ বিতরণের জন্য **আগরতলায়** ডেয়ারি ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গবাদি পশু ছাড়া বিভিন্ন স্থানে **শূকরের চাষ** ও হাঁস-মুরগির **পোলট্রি** খোলা হইয়াছে। **গান্ধীগ্রামে** রাজ্য পোলট্রি ফার্ম ছাড়াও অন্যান্য স্থানে আরও অনেকগুলি ফার্ম খোলা হইয়াছে।

খনিজ সম্পদ ঃ এই রাজ্য খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। ফেণী নদীর উপত্যকায় কিছু **লিগনাইট কয়লা** পাওয়া যায়। উদয়পুর, সাব্রুম ও বিলোনিয়ায় **চুনাপাথর** পাওয়া যায়। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে খনিজ তৈলের সন্ধান চালানো হইতেছে।



ধর্মনগর রেলস্টেশন

শিল্প সম্ভার ঃ এখনও পর্যন্ত এরাজ্যে শিল্প একেবারেই উন্নত

নহে। বর্তমানে ১টি চটকল প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছে। সম্প্রতিকালে এই রাজ্যে ছোট ছোট কারখানায় **লৌহের** কাজ ও **পিতলের** কাজ হইয়া থাকে। **চা** শিল্প একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। এরাজ্যে কোন রেলপথ নাই। **ধর্মনগরে** একটিমাত্র রেল স্টেশন মারফৎ আসাম এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা করিতে হয়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মোটর গাড়ি মারফৎ অনেক স্থানে যোগাযোগ করা যায় কিন্তু রাস্তা এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট উন্নত নহে।

পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে এখনও পর্যন্ত বিমান যোগাযোগই প্রধান অবলম্বন।

হস্তশিল্প ঃ অন্য কোন বিশেষ শিল্প না থাকিলেও এখানকার হস্তশিল্প যথেষ্ট উন্নত। বর্তমানে প্রচলিত শিল্পের মধ্যে হস্তচালিত **তাঁত, বাঁশ ও বেতের কাজ, চামড়ার কাজ** বেশ প্রশংসনীয়। নানা ধরনের তাঁতের কাপড় এখানে উৎপন্ন হয়। হস্তশিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য রাজ্যের বাহিরে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। এখানকার আনারসের মোরব্বা খুব বিখ্যাত। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র, কাঠ, তিল, বাঁশ, বেত ও জ্বালানি কাঠ অন্যত্র রপ্তানি করা হয়।

অনুশীলনী

১। ত্রিপুরার প্রধান প্রধান পর্বতগুলি ভূ-প্রকৃতিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে?

২। ত্রিপুরার জলবায়ুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। ত্রিপুরার অধিবাসী কাহারা? সেখানে হঠাৎ এত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি?

৪। আদিবাসীদের বাসস্থান ও পোশাক সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

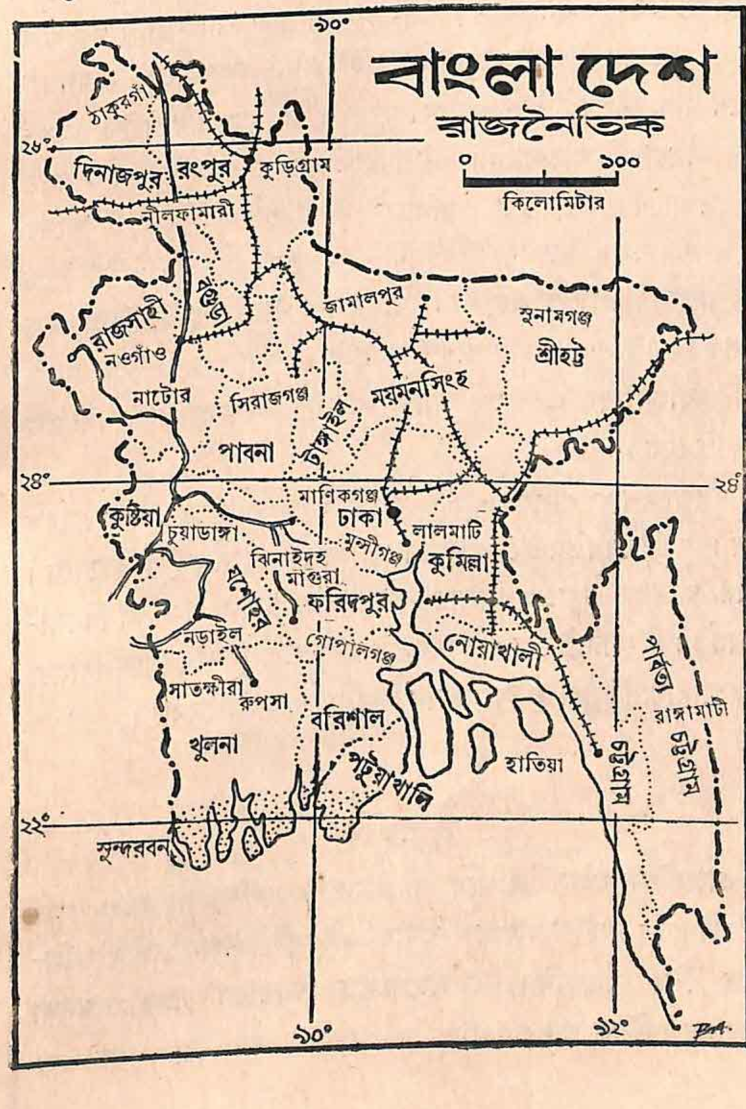
৫। ত্রিপুরার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কি?

৬। ত্রিপুরায় যানবাহন বা শিল্পের অনুন্নত অবস্থার পিছনে কি কি কারণ আছে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশ

দেশ পরিচিতি ঃ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক ভাবে ভারতবর্ষ



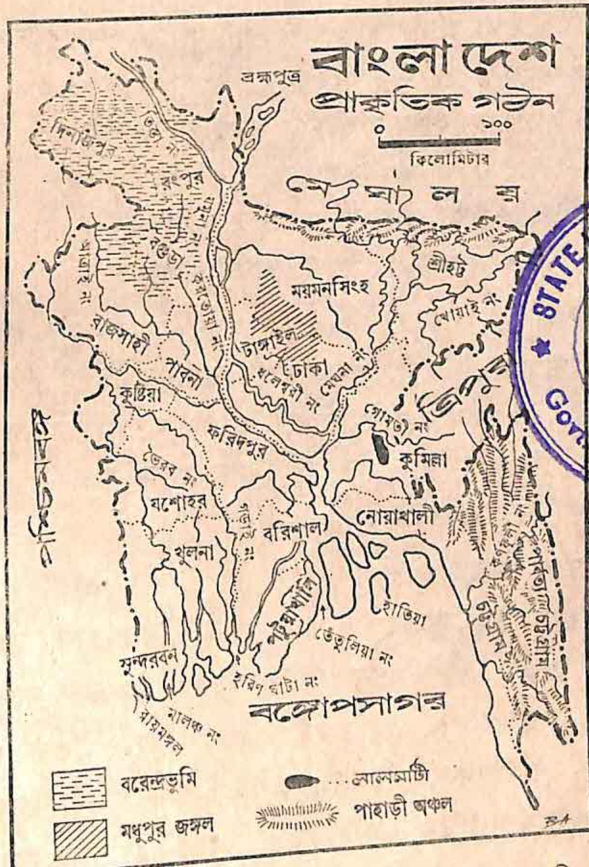
দুইভাগে বিভক্ত হয়—ভারত ও পাকিস্তান। ভৌগলিক দিক দিয়া প্রায় ২৪১৫ কিলোমিটারের ব্যবধানে দুই খণ্ডে বিভক্ত ছিল—পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একমাত্র ধর্ম ছাড়া কোন বিষয়ের মধ্যেই মিল ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে দুই অংশে নানা বিষয়ে, বিশেষ করিয়া ভাষা ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার লইয়া, বিবাদ বাধে। ঐ বিবাদ চরমে পৌঁছায় ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে। সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ববঙ্গ) সমস্ত মানুষের উপর নির্মম আক্রমণ চালায়। কিন্তু যুদ্ধে শেষপর্যন্ত বাঙালীদের জয় হয়। বাঙালীরা পাকিস্তানের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ঘোষণা করে। এই রাষ্ট্রের নামই বাংলাদেশ। ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর অনেক দেশ ইহাকে স্বীকৃতি দেয়।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ২৫ বৎসর আগে ভারতের একটি প্রদেশ ছিল। বর্তমানে তিনভাগের দুইভাগ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহার আয়তন ৫৫·১৩ হাজার বর্গমাইল (১·৪৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার)। ইহার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ।

ভূ-প্রকৃতি

প্রাকৃতিক গঠন হিসাবে বাংলাদেশের বেশীরভাগ অংশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ অঞ্চল—অর্থাৎ এই দুই প্রধান নদীর পলি-গঠিত নিম্ন সমভূমি। বাংলাদেশের উত্তরাংশ গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অংশ (দোআব)। পুরাতন পলিদ্বারা গঠিত এবং

অপেক্ষাকৃত উচ্চ—এই অংশকে **বরেন্দ্র** উচ্চভূমি বলা হয়। বাংলাদেশে গঙ্গার নাম **পদ্মা** হইয়াছে। এই পদ্মার অসংখ্য শাখানদী নিম্নের বদ্বীপকে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং এখনও নদীগুলি নূতন নূতন



জমি তৈয়ারি করিবার কাজে ব্যস্ত। পূর্বদিকে মেঘনা নদী প্রবাহিত হইয়াছে এবং নদী-দ্বারা সমগ্র অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। উত্তরাঞ্চলের মত যমুনা নদীর পূর্বে মধুপুর জঙ্গল নামে একটি উচ্চভূমি—স্থানীয়-

ভাবে জলবিভাজিকার কাজ করে। কুমিল্লা জেলায় গোমতী নদীর উপত্যকায় **ময়নামতি** নামে একটি প্রাচীন ও ঢেউ খেলানো উচ্চভূমি দেখা যায়। সাধারণভাবে সমস্ত অঞ্চলই সমভূমির অন্তর্গত।

এই বিস্তীর্ণ সমভূমি ব্যতীত দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে **কয়েকটি পাহাড়** সমান্তরাল ভাবে উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতে লুসাই পাহাড়ের সম্প্রসারণ **চট্টগ্রাম পাহাড়** সমস্ত **পার্বত্য চট্টগ্রামে** বিস্তার-লাভ করিয়াছে। উত্তর ত্রিপুরাতে (কুমিল্লা) কিছুটা উচ্চভূমি আছে। শ্রীহট্টের উত্তর সীমানায় অবস্থিত মেঘালয়ের গারো পাহাড়ের ঢাল বাংলাদেশের কিছুটা অংশে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

নদ-নদী : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। হিমালয় পর্বত হইতে নির্গত হইয়া বড় বড় নদী, যথা—**গঙ্গা**, **ব্রহ্মপুত্র** ইত্যাদি ভারতের বহু অঞ্চল বিধৌত করিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়া মিলিত ভাবে সাগরে বিলীন হইয়াছে। ইহাদের মিলন-ক্ষেত্রে অন্য দিক হইতে **মেঘনা** আসিয়া মিশিয়াছে।

উত্তরবঙ্গ হইতে অসংখ্য নদী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা বা যমুনাতে পড়িয়াছে। **তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া, মহানন্দা, পুনর্ভবা** প্রভৃতি নদী উল্লেখযোগ্য। পদ্মা হইতে **ইছামতী, মাথাভাঙ্গা মধুমতী, ভৈরব, গড়াই** প্রভৃতি নদী দক্ষিণে সাগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। **শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী** প্রভৃতি নদী মেঘনা ও যমুনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। **ঢাকা** শহর বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত। দক্ষিণে খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালি জেলার দক্ষিণাংশে সুন্দরবনে বহু নদী প্রবাহিত হইয়াছে এবং সমুদ্রের অনেক খাঁড়ির সৃষ্টি হইয়াছে।

জলবায়ু ঃ বাংলাদেশের জলবায়ু কতকটা সমভাবাপন্ন। পশ্চিমবঙ্গের সহিত ইহার অনেক মিল আছে—তবে বৃষ্টিপাত এখানে অনেক বেশী। ঢাকায় গড়ে বৃষ্টিপাত ১০০ ইঞ্চি (২৫৪ সেঃমিঃ) এবং আরও অনেকস্থানেই ১০০ ইঞ্চির উপর বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মে কালবৈশাখী ও আশ্বিন মাসে আশ্বিনের ঝড় নিয়মিতভাবে হইয়া থাকে।

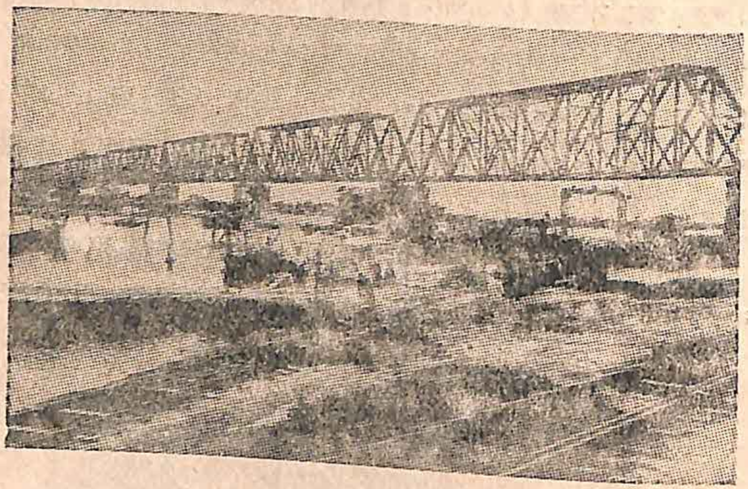
যানবাহন ঃ নদীমাতৃক দেশ বলিয়া এদেশে রেলপথ যথেষ্ট উন্নত নহে। বর্তমানে অনেকগুলি সেতু ও খেয়াঘাট-এর মারফৎ যোগাযোগ



খেয়াঘাটে হাটের দৃশ্য

ব্যবস্থা উন্নত হইয়াছে। অনেক বড় বড় প্রশস্ত রাস্তা প্রায় প্রতি শহরকেই যুক্ত করিয়াছে। স্টীমার এবং নৌকা যানবাহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য হেলিকপ্টার বা এরোপ্লেন-এর ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশে বিগত মুক্তিযুদ্ধের সময়

অনেক সেতু ধ্বংস হইয়াছিল। সেগুলি আবার নতুন করিয়া তৈয়ারি



নূতন মেঘনা সেতু

করা হইয়াছে। এই ধরনের সেতুর মধ্যে সারা সেতু ও মেঘনা সেতু উল্লেখযোগ্য।

অধিবাসী ও উপজীবিকা

বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে সাত কোটি অধিব বাস করে। ইহারা সকলেই বাঙালী। অধিবাসিগণের ভিতর ন্দু ও মুসলমান দুইই আছে। মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দু হইে অনেক বেশী। পূর্বাঞ্চলে কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম এলাকায় কিছু বৌদ্ধ াছে। সকলেই বাংলা ভাষায় কথা বলে। দেশ বিভাগের সময় বহার ও পাঞ্জাব অঞ্চল হইতে অনেক অবাঙালী মুসলমান এই দেশে গিয়াছিল; ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর তাহাদের অনেকে চলিয়া গিয়াছে

ঢাকার সন্নিকটে মীরপুর, মহম্মদপুর, উত্তরবঙ্গে সৈয়দপুর, পার্বতীপুর, ঈশ্বরদী প্রভৃতি স্থানে এখনও অনেক অবাঙালী মুসলমান আছে। বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলে অনেক আদিবাসী আছে। আসামের আদিবাসীদের সহিত তাহাদের অনেক মিল আছে।

বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগের উপর মানুষ কৃষিজীবী। এখানকার উর্বর পলিমাটিতে নানারূপ ফসল ফলে। মাছ ধরিয়া ও নৌকা চালাইয়া অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে। বড় বড় শিল্প এদেশে একেবারেই ছিল না। বর্তমানে চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ৪২টি চটকল গড়িয়া উঠিয়াছে; এই সব চটকলে ৫০ হাজারের মত শ্রমিক কাজ করে। কিছু কাপড়ের কল, দিয়াশলাই কারখানা ও রেলওয়ে ওআর্কশপে আরও কিছু লোক কাজ করে।

খাদ্য ও বাসস্থান

পশ্চিমবঙ্গের মত এখানকার মানুষেরাও ভাত ও মাছ খায়। পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে ইহারা ধুতির পরিবর্তে—পায়জামা বা লুঙ্গি পরে। শহরের অনেক লোক প্যাণ্ট ও সার্ট পরে। এখানকার মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের মত পোশাক পরে। বাংলাদেশের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই গ্রামে বাস করে। ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামগুলিতে মানুষেরা বাঁশ ও শনের সাহায্যে ঘর বানায়। বিত্তবানদের টিনের ঘর আছে। কোঠাবাড়ি খুব কম। শহরাঞ্চলে আধুনিক অট্টালিকা অনেক গড়িয়া উঠিয়াছে। এদেশে ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া প্লাবন হয়; ফলে প্রতি বৎসরেই ঘর মেরামত করিতে হয়।

ঘরবাড়ি তৈয়ারির ক্ষেত্রে বাঁশ, শন, খড় ও মাটির প্রাধান্য বেশী। শহরাঞ্চলে দালানকোঠা অনেক আছে।

উৎপন্ন দ্রব্য

কৃষিজ: বাংলাদেশ মূলতঃ **কৃষি প্রধান দেশ**। কৃষিজাত দ্রব্যই মূল **উৎপন্ন দ্রব্য**। পলিমাটি ও প্রচুর বৃষ্টিপাতে ধান প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং ধানের প্রকারভেদও অনেক। পশ্চিমবঙ্গের মত আমন, আউস ও বোরো ধান প্রধান। জলবায়ুর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বৎসরে তিনবার তিন ধরনের **ধান** উৎপন্ন হয়। জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়ায় তাই-চুং, আই. আর. প্রভৃতির চাষ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছে। ধানের পরেই **পাটের** নাম করা যাইতে পারে। পাটের চাষের জন্য অনুকূল জলবায়ু বাংলাদেশে বিদ্যমান। প্রচুর জল ও ভ্যাপসা গরম এই দুই উপাদান মিলিতভাবে পাটের চারাকে খুব সতেজ করে এবং প্রতিদিন উহা দ্রুত বাড়িয়া উঠে। **পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা বেশী পাটের চাষ এইখানে হয়।** পাট মারফৎ বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়া থাকে। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে **ইক্ষু, তামাক, তৈলবীজ, ডাল** উল্লেখযোগ্য। বৃষ্টির জন্য ভাল গম হয় না। কোন কোন স্থানে কিছু **তুলার** চাষ হয় সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে **নারিকেল ও সুপারি** জন্মে। চট্টগ্রাম, উত্তর কুমিল্লা ও শ্রীহট্টে প্রচুর পরিমাণে **চা** উৎপন্ন হয়। এদেশে ১৪৫টি চা বাগিচা আছে। চা-ও কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়া থাকে।

বনজ: বাংলাদেশের সমগ্র জমির প্রায় ১৬ ভাগ অংশে বনভূমি আছে জনবসতির চাপে প্রচুব বন কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

বর্তমানে চারিটি অঞ্চলে বন আছে—(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম, (২) খুলনার দক্ষিণে সুন্দরবন, (৩) শ্রীহট্ট, (৪) ঢাকা ও টাঙ্গাইলের কিছু অংশ (মধুপুর জঙ্গল)। সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণে **সুন্দরী কাঠ** পাওয়া যায়। সুন্দরী কাঠ ছাড়া **গেঁওয়া, গরাণ, ধুন্দুল** কাঠও প্রচুর পাওয়া যায়। এই সব কাঠ দ্বারা বাংলাদেশে কাগজের কল গড়িয়া উঠিয়াছে। সুন্দরবন হইতে প্রচুর পরিমাণে **গোলপাতা ও মধু** সংগৃহীত হয়। অনেক মানুষ গোলপাতার ঘরে বাস করে। চট্টগ্রাম অরণ্যের **গর্জন কাঠ** বড় বড় নির্মাণকার্যে ব্যবহার করা হয়। মধুপুর জঙ্গল **শাল** গাছের জন্য বিখ্যাত। ইহা ছাড়া প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই প্রচুর বাঁশ জন্মে।

খনিজঃ দেশ বিভাগের সময় কেবলমাত্র **চীনামাটি** পাওয়া যাইত। বর্তমানে কিছু কিছু **কয়লা, পিট (কাঠ কয়লা), প্রাকৃতিক গ্যাস ও চুনাপাথরের** সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট জেলার সীমানায় পিটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই পিটকে তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে (কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট জেলায়) প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গিয়াছে। শ্রীহট্টে প্রচুর চুনাপাথরের আমানত আছে। সম্প্রতিকালে চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজারের নিকট সমুদ্র সৈকতে পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন বালির (মোনাজাইট ও ইলমেনাইট) সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশকে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে খনিজ সম্পদ খুবই কম।

শিল্প সম্পদ

বাংলাদেশের শিল্পের প্রকারভেদ করিলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়—

(১) কৃষি-ভিত্তিক শিল্প—চটকল, কাপড়কল, হোসিয়ারী,

চালকল, ময়দাকল, চিনিকল, চা, তেলকল, চামড়া শিল্প ইত্যাদি।

(২) বন-ভিত্তিক শিল্প—নৌকা নির্মাণ, রেলপথের পাটাতন (স্লিপার), করাতকল ও আসবাবপত্র, দিয়াশলাই, প্লাইউড, কাগজ, রেয়ন ও নাইলন।

(৩) খনিজ-ভিত্তিক শিল্প—সিমেণ্ট, কাঁচ, রসায়ন ও সার, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ ও তৈলশোধনাগার।

শিল্প এখানে খুবই কম। কুষ্ঠিয়া, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে পাট ও কাপড়ের কল গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশে মোট ৪২টি চটকল, ২২টি কাপড়ের কল, ৭টি চিনি কল, ২৮টি অ্যালুমিনিয়াম কারখানা আছে। তাঁত শিল্প যথেষ্ট উন্নত। ঢাকার শাড়ী খুব বিখ্যাত। টাঙ্গাইলেও তাঁত শিল্প যথেষ্ট উন্নত। খনিজ সম্পদ খুবই কম। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে কিছু কিছু খনিজ সম্পদের সন্ধান চলিতেছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীতে জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনায় ২০,২০০ কিলোওআট শক্তি উৎপন্ন হয়।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় দ্রুত উন্নতির পথে যাইতেছে।

অনুশীলনী

১। বাংলাদেশের জন্ম কিভাবে হইল?

২। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা কর।

৩। নিম্নলিখিত স্থানগুলি সম্পর্কে টীকা লিখ :—
বরেন্দ্র ভূমি, মধুপুর জঙ্গল, ময়নামতি।

৪। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলির নাম কর। ইহাদের গতি কোন্ দিকে ?

৫। বাংলাদেশের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি কেন ?

৬। বাংলাদেশে জলসেচের ব্যবস্থা নাই কেন ?